ইতিহাস



(মধ্যযুগ)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ইতিহাস

(মধ্যযুগ)

(সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ

প্রথম সংস্করণ

মে ১৯৯৪
পুনর্মুদ্রণ মে ১৯৯৫

প্রকাশক ঃ
শ্রী উজ্জ্বল বসু
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক ঃ
বঙ্গবাসী লিমিটেড
২৬, নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা–৭০০০০৯

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এই বছর থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) প্রকাশ করেছে। এই পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সংগতি রেখে পর্ষৎ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক (মধ্যযুগ) প্রকাশ করছে।

প্রাচীন যুগের ইতিহাসে মানব সভ্যতার আদিকাল ও ভাঙ্গা-গড়ার কাহিনী যত সরল ছিল মধ্যযুগে তা নয়। আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এই যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন যাত্রায় নানা জটিল আবর্তের সৃষ্টি করেছে। এ যুগের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি প্রধানতঃ ধর্মীয় বিধি-বিধানের গণ্ডীতে বাঁধা পড়েছে। মানব সভ্যতার এই সব বৈশিষ্ট্য দেশ ভেদে ভিন্ন রূপ নিয়েছে। ধর্মীয় বিধি বিধানের কঠোরতা, অন্ধ বিশ্বাস ও রাজনৈতিক সংঘাত মধ্যযুগে সভ্যতার অগ্রগতিকে মন্থর করেছে বলে মনে করা হয়; কিন্তু ক্ষমতাবানদের অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেমে যায় নি; যুক্তি ও বিচারের দ্বারা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়নি। মানব সভ্যতার এই বহুধা ধারা নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও জটিল আবর্তের মধ্য দিয়ে মানুষের জয়যাত্রাকে সুনিশ্চিত করেছে--মধ্যযুগের শেষে সভ্যতার এক নবযুগের উন্মেষ ঘটিয়েছে।

মানব সভ্যতার এই রূপান্তর ও উত্তরণের ধারাবাহিক কাহিনী যথাসম্ভব সরলভাবে এই গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। বিষয়বস্তুর অনাবশ্যক ভার লাঘব করা হয়েছে। তাছাড়া, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের স্বশিক্ষণের জন্য পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু কার্যক্রমও পর্বভিত্তিক পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে। গ্রন্থটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিষয় অভিজ্ঞ বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ যথাযথ যত্ন নিয়েছেন। বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন/অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। সময়পঞ্জী, প্রামাণ্য চিত্র ও মানচিত্র ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির মানোন্নয়নে গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ সমাদৃত হবে।

৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট
কলকাতা-১৬
১৬ই এপ্রিল, ১৯৯৪

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

ইতিহাস

(মধ্য)

বাৎসরিক পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা

ইতিহাস (মধ্য)

শ্রেণী ঃ সপ্তম

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

প্রথম পর্ব

মে থেকে আগষ্ট

আঃ কার্যদিবস-৭২ দিন

পঠন-পাঠন ও তৎসম্পর্কিত

কার্যদিবস-৬৭ দিন

(সপ্তাহে ৩ পিরিয়ড হিসাবে)

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,

খেলাধূলা ইত্যাদি-৫ দিন

বিষয়ে প্রাপ্তব্য

আঃ পিরিয়ড-৩৩

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
১) মধ্যযুগ কাকে বলে-	ক) সূচনা			
	খ) ইউরোপে মধ্যযুগ	২		
	গ) ভারতবর্ষে মধ্যযুগ			
	ঘ) মধ্যযুগের স্বরূপ	২	৩	
২) ইউরোপে মধ্যযুগ-	ক) সূচনা			
	খ) জার্মানদের উপর হুণ আক্রমণ	১		
	গ) অভিবাসীদের জীবনপ্রণালী			
	ঘ) ইউরোপে নতুন মানবমিশ্রন	১		
	ঙ) অভিবাসীগনের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রসার			
	চ) মধ্যযুগ-অন্ধকার যুগ নয়	১	৩	
৩, বাইজানটাইন সভ্যতা-	ক) সূচনা			
	খ) সম্রাট কনস্টানটাইন	১		
	গ) সম্রাট জাস্টিনিয়ান			
	ঘ) জাস্টিনিয়ান আইন	১		
	ঙ) বাইজানটাইন শিল্প ও সংস্কৃতি			
	চ) বাইজানটাইন বাণিজ্য	১		

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
	ছ) রোমান সংস্কৃতির সংরক্ষণ			
	জ) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন	১	৪	
৪) ইসলাম ও তার প্রভাব	ক) আরবদেশ ও তার অধিবাসী	১		
	খ) হজরত মহম্মদ	২		
	গ) ইসলাম ধর্মের প্রসার			
	ঘ) খলিফাদের শাসন	১		
	ঙ) আরব সাম্রাজ্য			
	চ) ইউরোপে প্রতিক্রিয়া	১		
	ছ) বিশ্বসভ্যতায় আরবের দান			
	জ) আরব মণীষী	১	৬	
৫) মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ	ক) সূচনা			
	খ) শার্লাম্যান			
	গ) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান	১		
	ঘ) শার্লাম্যানের অভিষেক			
	ঙ) রাজ্যাভিষেকের গুরুত্ব	১		
	চ) রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের সম্পর্ক			
	ছ) অভিষেক দ্বন্দ্ব	১		
	জ) শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ	১		
	ঝ) খ্রীষ্টীয় মঠ (মনাস্টারি)			
	ঞ) জ্ঞানের সংরক্ষণ ও মঠ			
	ট) ক্লুনির সংস্কার	২		
	ঠ) বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি	১		

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
	ড) নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা			
	ঢ) কয়েকজন বিখ্যাত পন্ডিত ও মণীষী	১		
	ণ) ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক			
	ত) মঠের বাইরে শিক্ষা ব্যবস্থা	১	৯	
৬) ইউরোপে সামন্ততন্ত্র	ক) সূচনা			
	খ) সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য	২		
	গ) শিভ্যালরি			
	ঘ) ত্রুবাদুর			
	ঙ) দুর্গ	১		
	চ) ম্যানর ব্যবস্থা	১	৪	
৭) শ্রেণীতে ইতিহাস সম্পর্কিত স্বশিখন কার্যক্রম	ক) বিতর্ক সভা			
	খ) শিক্ষার্থীদের আলোচনা			
	গ) অনুচ্ছেদ লিখন		৪	
	ঘ) মানচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি			

দ্বিতীয় পর্ব
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
বিদ্যালয়ের আঃ মোট
কার্যদিবস—৬৮ দিন
পঠন-পাঠন
কার্যদিবস—৫৮ দিন

ষান্মাসিক পরীক্ষা, সাংস্কৃতিক
কাজকর্ম, খেলাধূলা—১০ দিন

বিষয়ে প্রাপ্তব্য পিরিয়ড—২৯

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
৮) ইউরোপে সামন্ততন্ত্র	ছ) ম্যানরে শ্রেণীবিন্যাস			
	জ) কৃষক ও সার্ফদের অবস্থা	১		
	ঝ) কৃষক বিদ্রোহ	১	২	
৯) ক্রুসেড	ক) সূচনা			
	খ) ক্রুসেডের বিবরণ	১		
	গ) ক্রুসেডের উদ্দেশ্য			

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
	ঘ) ক্রুসেডের প্রভাব	২	৩	
১০) ইউরোপে নগরের উদ্ভব	ক) সূচনা			
	খ) নগর বিকাশের ধারা	১		
	গ) গিল্ড ব্যবস্থা			
	ঘ) গিল্ডের কার্যাবলী	১		
	ঙ) নগরজীবন			
	চ) স্বায়ত্তশাসন লাভ	১	৩	
১১) মধ্যযুগে সুদূর প্রাচ্য	মধ্যযুগে চীন (৭ম—১৪শ শতাব্দী)			
ক) তাং যুগ-	ক) তাং যুগ			
	খ) আইনের পুর্নগঠন	১		
	গ) তাং যুগের শিক্ষা, কাব্য, অঙ্কন ও মুদ্রণ			
	ঘ) চা	১		
	ঙ) তাং যুগের কৃষিকাজ ও বাণিজ্য			
	চ) চীনে বৌদ্ধধর্ম	১		
	ছ) চীন সভ্যতার বিস্তার-কোরিয়া ও জাপানে	১	৪	
খ) সুং যুগ	জ) সুং যুগ			
	ঞ) সুং যুগের সংস্কার-পরীক্ষা-নিরীক্ষা			
	ট) বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ	১		
	ঠ) কৃষি সংস্কার			
	ড) শিক্ষা-সংস্কৃতি	১	২	
গ) ইউয়ান যুগ	ঢ) মোঙ্গল জাতি			
	ণ) কুবলাই খাঁ			
	ত) ঐ যুগে বৌদ্ধধর্ম			
	থ) মার্কোপোলো	১	১	

একক	উপএকক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
ঘ) মধ্যযুগে জাপান	দ) সূচনা			
	ধ) আদি পর্বে জাপান			
	ন) মিকাডো	১		
	প) চীনের সাথে সম্পর্ক			
	ফ) মিকাডো-গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব			
	ব) শোগুনেট			
	ভ) সামুরাই			
	ম) বুশিডো	১	৪	
১২) ভারতবর্ষ- (৫ম—৭ম শতাব্দী)				
ক) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন-	ক) হূণ আক্রমণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন	১		
খ) গুপ্ত পরবর্তী যুগ	ক) হর্ষবর্ধন		১	
	খ) হর্ষবর্ধনের রাজ্য বিস্তার			
	গ) হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব	১		
	ঘ) হিউয়েন সাঙ			
	ঙ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়	২	৪	
গ) হর্ষ পরবর্তী যুগ (৮ম—১২শ শতাব্দী)	চ) রাজপুত রাজ্য	১		
	ছ) রাজপুত সমাজে সামন্ততন্ত্র			
	জ) ত্রিমুখী লড়াই			
	ঝ) ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি	২	৩	
১৩) প্রথম পর্বের মত ইতিহাস সম্পর্কিত শ্রেণীতে স্বশিখন কার্যক্রম	ক) মানচিত্র অঙ্কন প্রভৃতি	২	২	

তৃতীয় পর্ব
জানুয়ারী থেকে এপ্রিল
বিদ্যালয়ের আনুমানিক
মোট কার্যদিবস—৯০ দিন
মোট পঠনপাঠন প্রাপ্তব্য দিন—৪৫ দিন

মাধ্যমিক পরীক্ষা—১০ দিন
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা—১৫ দিন
বাৎসরিক পরীক্ষা—১০ দিন
ফলপ্রকাশ, পাঠপরিকল্পনা
ইত্যাদি—১০ দিন

বিষয়ে প্রাপ্তব্য আঃ
পিরিয়ড—২৩

মোট
৪৫ দিন

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
১৪) ঘ)মধ্যযুগের বাংলা	ক) সূচনা			
	খ) শশাঙ্ক	১		
	গ) পাল ও সেনবংশ	১		
	ঘ) সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, অর্থনীতি ও জীবিকা			
	ঙ) উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমন্বয়	২	৪	যে সব বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র নেই সেখানে পঠনপাঠন পিরিয়ড পুনর্বিন্যাস করে নিতে হবে।
ঙ) দক্ষিণ ভারত-	চ) সূচনা			
	ছ) চালুক্য			
	জ) পল্লব শিল্প			
	ঝ) চালুক্য ও পল্লব	১		
	ঞ) চোল			
	ট) ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র	১	২	
১৫) বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ-	ক) সূচনা			
	খ) স্থলপথে যোগযোগ মধ্য এশিয়া-চীন—			
	গ) চীন ও তিব্বতে ভারতীয় প্রভাব	১		
	ঘ) সমুদ্রপথে যোগাযোগ, বৃহত্তর ভারত—সুবর্ণভূমি-চম্পা, কম্বোজ, মালয় ও যবদ্বীপ	২	৩	

১৬) ইসলামের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ—	ক) সূচনা খ) তুর্কো-আফগান আমল (১২০৬—১৫২৬ খ্রীঃ) গ) কেরল ও সিন্ধুদেশ, মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া ঘ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ	১	
	ঙ) সুলতানী শাসনের সূচনা চ) সুলতানী যুগ-রাজনৈতিক	৩	
	ছ) সুলতানী যুগে সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন	১	
	জ) সুলতানী যুগে বাংলা ঝ) ভক্তিবাদ ও সুফী আন্দোলন-শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক, কবীর ইত্যাদি	৩	
	ঞ) হিন্দু মুসলিম ঐক্য ও শিল্প-সংস্কৃতির সমন্বয়, সাহিত্য চর্চা	১	৯
১৭) মধ্যযুগের শেষ পর্ব-১৪শ—১৫শ শতাব্দী	ক) কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন খ) রেনেসাঁস গ) রেনেসাঁস মনীষী- ঘ) ভৌগোলিক আবিষ্কার	১	
	ঙ) জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব নেদারল্যান্ড (হল্যান্ড) চ) ইউরোপের সম্প্রসারণ—ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য		

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
	ছ) পুরাতন ও পরিবর্তনের সংঘাত			
	জ) কৃষক বিদ্রোহ- ইংল্যান্ড	১	২	
১৮) প্রথম পর্বের অনুরূপ শ্রেণীতে পাঠ্যসূচী বিষয়ে স্বশিখন কাজকর্ম-	ক) বিতর্ক সভা খ) দলভিত্তিক আলোচনা গ) অনুচ্ছেদ লিখন ঘ) শ্রেণী প্রদর্শণী ইত্যাদি		৩	

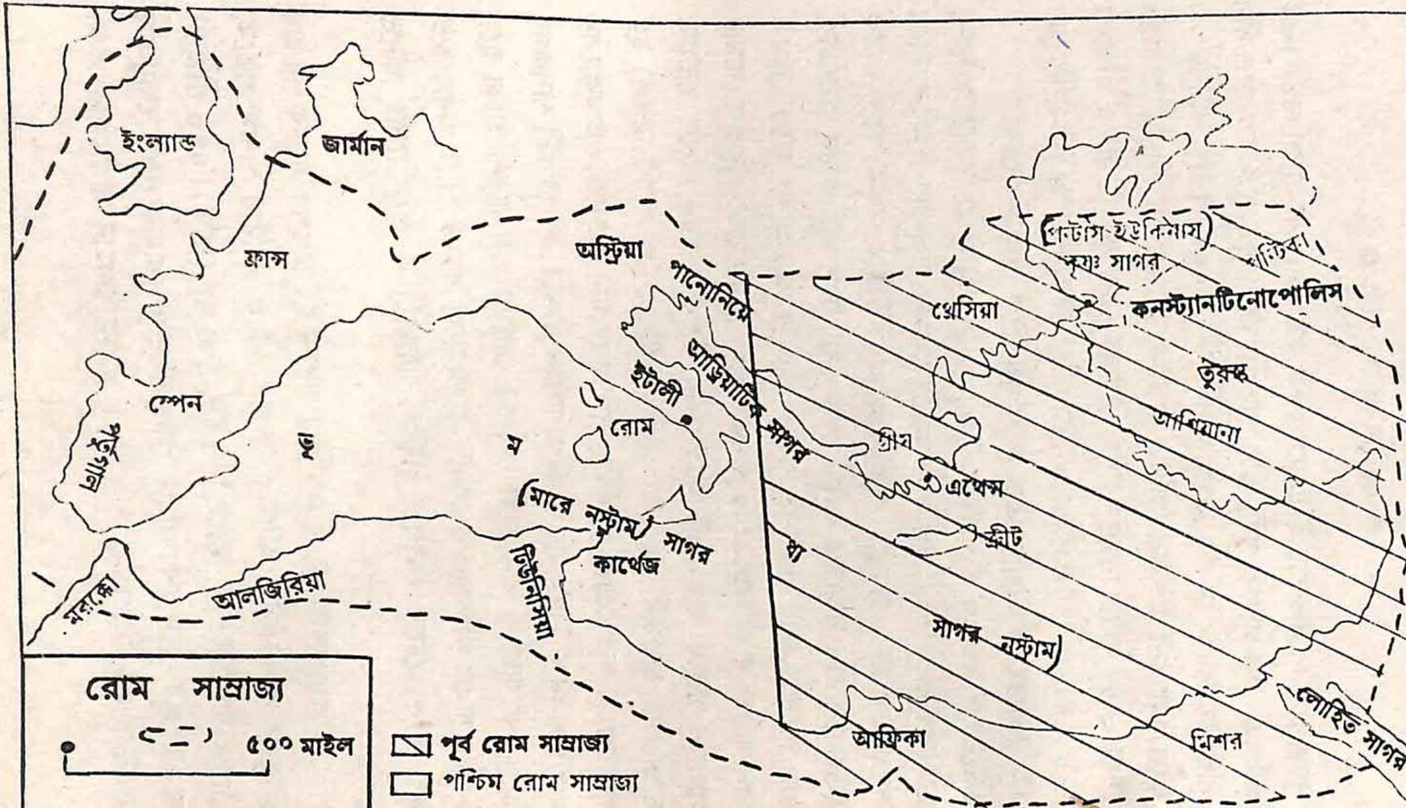
।। প্রথম অধ্যায়।।

● মধ্যযুগ কাকে বলে ●

সূচনা ঃ মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় নানা ধরনের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন সাধারণত খুবই ধীর গতিতে ঘটে। শত শত বৎসরের ধীর পরিবর্তন কালক্রমে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটায়। এইরূপ পরিবর্তনের ফলে সমাজের প্রচলিত আর্থিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর দেখা দেয়। ধর্মীয় বিশ্বাসে, শিক্ষা-দীক্ষায়—এক কথায়, সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় রূপান্তর ও নতুন গতি। পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদ্‌গণ এই রূপান্তরের কালকে এক নতুন যুগ রূপে চিহ্নিত করেন।

ইউরোপে মধ্যযুগ ঃ প্রাচীন ইউরোপে যে সমাজ ও সভ্যতার সূচনা হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল দাস মজুর। রোমান সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে দাস সমাজব্যবস্থার পরিপূর্ণতা ঘটে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে ইউরোপে দাস সমাজের ভাঙ্গন দেখা দেয়। দাস মালিকদের অত্যাচার, দাস বিদ্রোহ এবং বহিরাগত জাতি গোষ্ঠীর আক্রমণের ফলে রোমান দাস-মালিক বা অভিজাতদের শাসন ভেঙ্গে পড়তে থাকে। বিশাল রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। দুটি সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় রোম। বাইজানটিয়াম (কনস্ট্যান্টিনোপল) হয় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অল্পকালের মধ্যেই পতন ঘটে। রোমান সম্রাট অগাস্টাস সীজার-এর পরবর্তী শাসকগণ ছিলেন অযোগ্য ও অত্যাচারী। পশ্চিম রোমের দাস ব্যবসা অচল হয়ে পড়ে। রোমান অভিজাত ও সেনাপতিদের মধ্যে বিরোধ রোমে অরাজকতা সৃষ্টি করে। দেশে ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রজাবিদ্রোহ ঘটতে থাকে।

এই অরাজকতার যুগে জার্মানরা পশ্চিম ইউরোপের একের পর এক প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব অধিকার করতে থাকে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে রোমান সম্রাটের রাজ্য বলতে ছিল ইটালী ও গল (ফ্রান্স)। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অডোয়েকার নামে এক জার্মান সেনাপতি শেষ রোমান সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাসকে সিংহাসনচ্যুত করেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন


ইংল্যান্ড
জার্মান
ফ্রান্স
অস্ট্রিয়া
স্পেন
ইটালী
রোম
আড্রিয়াটিক সাগর
থ্রেসিয়া
কনস্ট্যানটিনোপোলিস
তুরস্ক
গ্রীস
এথেন্স
ক্রীট
(মারে নস্ট্রাম) সাগর
সাগর নস্ট্রাম)
কার্থেজ
টিউনিসিয়া
আলজিরিয়া
মরক্কো
আফ্রিকা
মিশর
লোহিত সাগর
রোম সাম্রাজ্য
৫০০ মাইল
পূর্ব রোম সাম্রাজ্য
পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য

সম্পূর্ণ হয়। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে ইউরোপের প্রাচীন যুগের অবসান এবং মধ্যযুগের সূচনা হিসাবে ইতিহাসবিদ্‌গণ গণ্য করেন।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে ইউরোপের প্রাচীনযুগের অবসান এবং এক নবযুগের সূচনাকাল হিসাবে গণ্য করার কারণ হলো এই সময় থেকেই পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। **প্রথমত,** এই সময় থেকেই প্রাচীন দাস সমাজের অবলুপ্তি ঘটতে থাকে। জার্মানরা রোমের বিভিন্ন প্রদেশে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। রোমান ও জার্মানদের মেলামেশার ফলে রোমানদের সামাজিক রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। স্বাধীন জার্মান মজুররা ছিল কঠোর পরিশ্রমী। তারা জমিতে চাষ-আবাদ করে প্রচুর ফসল ফলায়, অনেকে জমির মালিকও হয়ে বসে। পরে তারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। রোমান ও জার্মানদের মিলনে পশ্চিম ইউরোপে এক নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। **দ্বিতীয়ত,** রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে জার্মানরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রোমান অভিজাতদের সরিয়ে জার্মান যোদ্ধারা এক একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। জার্মানদের প্রাচীন গোষ্ঠী প্রধানের শাসন কর্তৃত্বের অবসান হয়। রোমানদের মতই জার্মানদের রাজপদ বংশানুক্রমিক পদে পরিণত হয়। জার্মান রাজারা রোমের আইনের সাহায্যেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। **তৃতীয়ত,** জার্মানরা জমির মালিক হয়ে স্বাধীন চাষীদের চাষের কাজে নিয়োগ করে। জার্মান জমিদাররা ছিলেন কেবলমাত্র জমির মালিক। চাষীরা তাদের আশ্রিত প্রজা, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এই নতুন আর্থিক ব্যবস্থায় চাষী তার পরিবার পরিজন নিয়ে জমিদারের এলাকায় প্রায় স্বাধীনভাবে বসবাস করত এবং উৎপাদিত ফসলের ভাগ ভোগ করার অধিকার পেত। এই ভাবে নতুন এক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যা **ফিউডাল ব্যবস্থা** বা **সামন্তপ্রথা** নামে পরিচিত। **চতুর্থত,** পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও খ্রীষ্টান চার্চের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং চার্চই সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। পশ্চিম ইউরোপে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে চার্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চার্চের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। চার্চগুলি

এই যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির একমাত্র কেন্দ্র হয়ে ওঠে। গ্রীক ও রোমানদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। ল্যাটিন ভাষা ও ধর্মতত্ত্ব রোমান ও জার্মানদের শিক্ষার বিষয় হয়। ইউরোপের ইতিহাসের যে রূপান্তরের কথা উল্লেখ করা হল তা কেবলমাত্র ইউরোপেই দেখা গিয়েছিল তা নয়, পৃথিবীর সব দেশেই এই রূপান্তরের পালা চলে। তবে প্রত্যেক দেশেরই মানুষ ও তার পরিবেশে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের জন্য প্রত্যেক দেশের সভ্যতার রূপান্তরের কালের ভিন্নতা আছে। রূপান্তরের বৈশিষ্ট্যগুলিও দেশ ও কালভেদে পৃথক।

ভারতবর্ষে মধ্যযুগ ঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মধ্য এশিয়ার 'হূণ' নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। ভারতবর্ষে তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসন শিথিল হয়ে পড়ছিল। পশ্চিম ইউরোপে প্রায় একই সময়ে চলছিল জার্মান গোষ্ঠীগুলির আক্রমণ। জার্মানদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়নি--দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে গুপ্তরাজ বুধগুপ্তের রাজত্বকালের সময় পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভেঙ্গে যাবার আগে থেকেই ভারতবর্ষের সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন দেখা দেয়। ইউরোপের মত ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থা **দাস মজুরদের উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, তবে ক্রীতদাস প্রথা ছিল।** গুপ্ত যুগের শেষে ক্রীতদাস প্রথা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু দাস প্রথার সম্পূর্ণ অবসান হল না। ধনী শ্রেষ্ঠী সদাগর সমাজে ক্রীতদাস প্রথা থেকেই গেল। কৃষির ক্ষেত্রে স্বাধীন চাষী জমিতে চাষ-আবাদ করার এবং উৎপন্ন ফসল ভোগ করার অধিকার পেল। জমির মালিকরা হলেন সামন্ত রাজা। সামন্ত রাজারা যেমন ছিলেন জমি ও রাজস্বের অধিকারী, তেমনি চাষী ও তার পরিবার পরিজনেরও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। চাষীর জীবন ছিল জমির সঙ্গে বাঁধা। এই নতুন আর্থিক ব্যবস্থাকে বলা হয় **সামন্ততন্ত্র**। গুপ্তযুগের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতবর্ষে এই রূপান্তর দেখা দিলেও **গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে ভারতবর্ষে মধ্যযুগের প্রাথমিক সূচনা** বলে ধরা হয়। ইউরোপের মত ভারতবর্ষেও মধ্যযুগের সময়সীমা

মোটামুটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ধরা হয়।

মধ্যযুগের স্বরূপ ঃ ইতিহাসে মধ্যযুগ মানবসভ্যতার প্রাচীন বা আধুনিক যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইতিহাস নদীর স্রোতের মতই প্রবহমান। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ তার জীবনধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ঘটনাস্রোত মানবসভ্যতার নতুন নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। নতুন ও পুরাতনের সমন্বয়ে এই নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। পুরাতন সভ্যতার মধ্য থেকেই নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তাই, প্রাচীনকালকে বাদ দিয়ে মধ্যযুগের অস্তিত্ব ভাবা যায় না। আবার, আধুনিক যুগের মধ্যেও মধ্যযুগের অনেক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।

দেশ ভেদে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। যেমন, ভারতবর্ষে মধ্যযুগে ব্রাহ্মণরা সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, ইউরোপের যাজকরা ঠিক তা করেননি। ইউরোপের ব্যারণ নামে খ্যাত অভিজাত ভূস্বামীরা যে ভূমিকা পালন করতেন, ভারতবর্ষের সামন্ত রাজারা সেই একই ভূমিকা পালন করেছেন--তা বলা যাবে না। আবার দু'দেশেই পুরোহিত ও ভূস্বামীরা কোনরকম শ্রম না দিয়ে অন্যের শ্রমের ফসল আত্মসাৎ করতেন। উভয় দেশেই পুরোহিত ও ভূস্বামীরা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান দুই স্তম্ভ ছিলেন। ইউরোপের মঠগুলির মত ভারতের বৌদ্ধমঠ ও হিন্দু মন্দিরগুলি ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। এইরূপ সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য।

● কী শিখলে ●

- সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় রূপান্তর ও নতুন গতি যাকে বলা হয় এক নতুন যুগের সূচনা। দেশভেদে ঐ রূপান্তরে নানা পার্থক্য আছে।
- পঃ রোম সাম্রাজ্যের পতনে ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা ও ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে মধ্যযুগের শুরু ধরা হয়।
- মধ্যযুগে রোমান ও জার্মানদের মিলনে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়।
- ইউরোপ ও ভারতে সামন্তপ্রথা গড়ে ওঠে, তবে ভিন্ন ধরনের।
- ইউরোপে ধর্ম, চার্চ এবং ভারতে ব্রাহ্মণ, মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ শিক্ষাকে পরিচালনা করত।

● ইউরোপে প্রাচীন দাস ব্যবস্থা লোপ পায় কিন্তু ভারতে ক্রীতদাস প্রথা ভেঙে গেলেও উহার সম্পূর্ণ অবসান হয়নি।

অনুশীলনী

১। দু-এক কথায় উত্তর লেখ ঃ

(ক) প্রাচীন ইউরোপে সমাজের ভিত্তি কী ছিল ?

(খ) পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কী?

(গ) ভারতবর্ষে ঐ সময় কোন বংশ রাজত্ব করত ?

(ঘ) রোমের শেষ সম্রাট কে ছিলেন?

(ঙ) ভারতে কোন সময় থেকে মধ্যযুগের সূচনা হয়?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) ইতিহাসে 'যুগ' বলতে কী বোঝায়?

(খ) ইউরোপে দাস ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে কেন?

(গ) জার্মানদের আমলে চাষীদের অবস্থার কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

(ঘ) সামন্তপ্রথা কি?

(ঙ) চার্চ কিভাবে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ও শিক্ষাদীক্ষা বজায় রেখেছিল?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা কিভাবে ঘটে ব্যাখ্যা কর।

(খ) রোমের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে কেন?

(খ) ইউরোপের রোম সাম্রাজ্যের পতনকে 'নতুনযুগ' বলা হয় কেন?

(গ) গুপ্তযুগে সামন্ত প্রথা কিভাবে গড়ে ওঠে?

(ঘ) মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(ঙ) ইউরোপ ও ভারতের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি ছিল?

৪। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে —৪৭৬ খ্রীঃ/১৭৫৭ খ্রীঃ/১৮৫৭ খ্রীঃ /১৯৪৭ খ্রীঃ

(খ) — ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল জার্মান জাতিরা/হূণশক্তি/গুপ্ত রাজারা/হর্ষবর্ধন।

৫। শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি বসাও ঃ

(ক) রোমের শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন ——।

(খ) মধ্যযুগে সময়সীমা ছিল —— পর্যন্ত।

(গ) ভারতের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি প্রধানত ছিল —— ও ——।

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

● ইউরোপে মধ্যযুগ ●

সূচনা ঃ জার্মানদের পশ্চিম ইউরোপে আগমনের কাল থেকে ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা। জার্মান গোষ্ঠীগুলির বসতি ছিল উত্তর ও মধ্য ইউরোপের অরণ্যসংকুল অঞ্চলে। খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে জার্মান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আদিম পশুপালন ও শিকারী জীবনে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তারা ক্রমে কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকে। উর্বর কৃষিক্ষেত্রের সন্ধানে জার্মানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী দেশত্যাগ করে ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণে এগিয়ে যেতে থাকে। এই সময়ে রোমে দাস ব্যবসা ভেঙ্গে পড়ছিল। জার্মান চাষী ও সৈনিকদের সাহায্য রোমানদের পক্ষেও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যেই জার্মানদের বসবাস করার অনুমতি দেন। চতুর্থ শতক পর্যন্ত জার্মানরা শান্তিপূর্ণভাবেই রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বসতি গড়ে তোলে।

জার্মানদের উপর হূণ আক্রমণ ঃ

খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকের শেষদিকে এক দুর্ধর্ষ জাতি জার্মানদের আক্রমণ করে। এই দুর্ধর্ষ জাতির নাম হূণ। হূণরা মোঙ্গল জাতির একটি শাখা। পীতবর্ণ, খর্বাকৃতি হূণরা ছিল সাহসী যোদ্ধা। এরা দল বেঁধে থাকত। চলতো তীরধনুক নিয়ে। তারা দিন কাটাত ঘোড়ার পিঠে। এদের বসতি ছিল চীনের পশ্চিম অংশে, ভারতের উত্তর পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরাঞ্চলে। খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতক থেকেই মধ্য এশিয়ার জাতি গোষ্টীগুলি তাদের আদি বাসভূমি ছেড়ে সরে যেতে থাকে। হূণরা পশ্চিমে এগোতে শুরু করলে জার্মানদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। জার্মান গোষ্ঠীগুলি আরও পশ্চিমে সরে যায়। ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিসিগথরা হূণদের কাছে পরাস্ত হয়ে রোম সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়ে। গথদের অপর শাখা অস্ট্রোগথদের এক অংশ ভিসিগথদের আশ্রিত হিসাবে রোমান সাম্রাজের মধ্যে বসবাস করতে থাকে। হূণ আক্রমণের চাপে ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, বার্গান্ডিয়ান প্রভৃতি জার্মান উপজাতি গোষ্ঠী রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে ঢুকে পড়ে।



জার্মান জাতির অভিযান পথ

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের শেষ সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাস অডোয়েকার নামে জার্মান যোদ্ধার হাতে পরাস্ত হলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও রোমান সভ্যতার দুটি দান থেকে যায়। একটি রোমান আইন। দ্বিতীয়টি, রোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার অস্তিত্বে বিশ্বাস। আসলে, পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি বিস্তারকালে জার্মানরা রোমের আইনগুলিকে মেনে নিয়েছিল। জার্মানদের কোন লিখিত আইন ছিল না। তাই রোমান সাম্রাজ্যের লিখিত আইনগুলি মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। অন্যদিকে, রোমানরা কখনই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ধারণায় বিশ্বাসী ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম -- দুই সাম্রাজ্যের অস্তিত্বও তারা স্বীকার করেনি। তারা প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিল। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটগণ এবং জার্মানরাও রোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন।

অভিবাসীগণের জীবনপ্রণালী ঃ বহিরাগত মানুষ যখন কোন দেশের ভেতরে বসতি স্থাপন করে তখন সেই মানুষকে অভিবাসী বলা হয়। জার্মান মানুষরাও ছিল রোম সাম্রাজ্যের অভিবাসী, কারণ কালক্রমে তারা রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে বসতি বিস্তার করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ফ্রাঙ্কদের বসতি ছিল রাইন নদীর তীরে এবং আরও একটু ছড়ানো অঞ্চলে-- হল্যান্ড, ফ্ল্যাণ্ডার্স, কলোন প্রভৃতি স্থানে। স্যাক্সন ও কেল্টরা চলে গিয়েছিল ইংল্যান্ডে। ভিসিগথরা পীরেনিজ পাহাড় অতিক্রম করে স্পেনে বসতি স্থাপন করে। ভ্যাণ্ডালরা গিয়েছিল দক্ষিণ স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায়, অস্ট্রোগথরা মধ্য ইটালী ও বলকান অঞ্চলে এবং লম্বার্ডরা দক্ষিণ ইটালীতে। এইভাবে রোম সাম্রাজ্যের অভিবাসীরূপে জার্মানরা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সমাজজীবন ঃ রোমান ঐতিহাসিক **কর্ণেলিয়াস** ট্যাসিটাসের লেখা 'জার্মানীয়া' গ্রন্থ থেকে আমরা জার্মানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের কথা জানতে পারি। তারা অর্ধ যাযাবর ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি হলেও তাদের সমাজজীবনে নীতি ও শৃঙ্খলা ছিল। যুদ্ধ ও শিকার,

গো পালন ও কৃষিকাজ ছিল জার্মানি পুরুষদের মূল জীবিকা। যুদ্ধবন্দীরা দাসরূপে সমাজের শ্রম জোগাত। স্ত্রীলোকরাও মর্যাদা পেত। সমাজে নারীর নৈতিক সততার মূল্য দেওয়া হত।

রাজনৈতিক সংগঠন ঃ জার্মানদের রাজনৈতিক সংগঠনের চারটি স্তর ছিল। একদম বুনিয়াদী স্তরের সংগঠন হল গ্রাম। কিছু গ্রাম নিয়ে গঠিত হত হান্ড্রেড। কয়েকটি হান্ড্রেড নিয়ে গৌ, আর সমস্ত গৌ নিয়ে রেইক বা রাষ্ট্র। জার্মানদের আইন সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। কেউ অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দেবে রাষ্ট্র একথা তারা রোম সাম্রাজ্যে এসে শিখে ছিল।

ধর্ম ঃ জার্মানদের ধর্ম ছিল প্রকৃতির আরাধনা ও পূর্বপুরুষের উপাসনা। প্রকৃতির শক্তিকে তারা দেবদেবী বলে পূজা করত। যেমন তাদের বজ্রের দেবতার নাম ছিল 'থর', আকাশ ও বিবাহের দেবীর নাম ফ্রিগা, অলৌকিকতা ও কবিতার দেবতার নাম ওডেন আর যুদ্ধ দেবতার নাম ছিল 'টায়ার।* দেবতার উদ্দেশে পশুবলি প্রথা চালু ছিল। সুসভ্যতার আলোক তাদের স্পর্শ করেনি। তাই তাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল আদিম ও সরল।

ইউরোপে নতুন মানবমিশ্রণ ঃ জার্মানিরা ছিল মূলতঃ টিউটন জাতি। তারা স্ক্যান্ডেনেভিয়া* অঞ্চল থেকে এসেছিল। তাদের নিজস্ব সভ্যতা ছিল। রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার পর থেকে তাদের সঙ্গে রোমানদের দেয়ানেয়া শুরু হয়। এইভাবে দুটি স্বতন্ত্র সভ্যতার মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হয় এবং রোমান ও জার্মানি রীতিনীতির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে। ফলে এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়। জার্মানিরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তাদের আইনকানুন ও সাহিত্য রোমান সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। কালক্রমে জার্মানদের সঙ্গে রোমানদের বৈবাহিক সম্পর্কও শুরু হয়। জার্মানি রাষ্ট্রব্যবস্থা নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখেও রোমের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আয়ত্ত করে নেয়। এর ফলে যে নতুন ভাবধারার জন্ম নেয় তার থেকে

---

* স্ক্যান্ডেনেভিয়া ইউরোপের সুইডেন ও নরওয়ে অঞ্চল।

* সপ্তাহের ৭ দিনের ইংরাজী নামগুলি এসেছে জার্মানদের দেবদেবীর নাম থেকে। থর=থার্সডে, ফ্রিগা=ফ্রাইডে, ওডেন=ওয়েডনেসডে ইত্যাদি।

ইউরোপের পরবর্তীকালের ভাষা ও জাতিসমূহ গড়ে ওঠে।

অভিবাসী জার্মানদের উপর খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব ঃ

রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে জার্মান জাতি খ্রীষ্ট ধর্মের সংস্পর্শে আসে। খ্রীষ্টধর্ম থেকে তারা নৈতিকতা, সদাচার ও সংযমের শিক্ষা গ্রহণ করে। জার্মানদের আদি ধর্ম ছিল অলিখিত, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম ছিল লিখিত। নতুন ধর্মকে বোঝার আগ্রহে অনেকেই ল্যাটিন ভাষা গ্রহণ করে। এইভাবে জার্মানদের যাযাবর জীবনে পরিবর্তন ঘটে। দুর্ধর্ষ জাতিগুলি উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ক্রমশ সুসভ্য হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় সংস্কৃতিও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

মধ্যযুগের শুরু—অন্ধকার যুগ নয় ঃ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের চারশ' বছর থেকে সাতশ' বছর পর্যন্ত সময়কে অনেক সময়ে **'অন্ধকার যুগ'** বলা হয়ে থাকে। কথাটা ঠিক নয়। আসলে রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, তার সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্য অত্যন্ত বেশী ছিল ও তা বহুদিন ধরে টিকে ছিল। রোম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়। মানুষের শান্তির অভাব ঘটে। এসবের ফলে সকলের মনে হতে পারে যে, ইউরোপে সভ্যতার বাতিটি নিভে গেছে। কিন্তু ইউরোপে জ্ঞানের চর্চা বন্ধ হয়নি। বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় মঠের সন্ন্যাসীরা তাকে বন্ধ হতে দেননি। বিভিন্ন মঠে থাকত বইয়ের ভাণ্ডার। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের পুঁথিগুলি নকল করা সন্ন্যাসীদের একটি দৈনন্দিন কাজ ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ওয়ারমাউথ, জ্যারো, ববিও নামক স্থানে অবস্থিত মঠগুলিতে বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। জ্ঞানের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীরা ন্যায়-অন্যায়ের বোধটিকেও বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেবা ও বিদ্যাচর্চার আদর্শের সঙ্গে ধর্ম চর্চার আদর্শ যুক্ত হয়। সেন্ট বেনেডিক্ট নামে এক সন্ন্যাসী খ্রীষ্টিয় মঠের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার ভাব জাগাতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। খ্রীষ্টিয় সমাজব্যবস্থা ন্যায়-অন্যায়ের নীতির উপরই দাঁড়িয়েছিল। সব শুভ চেতনা মধ্যযুগে নষ্ট হয়ে যায়নি। অশিক্ষা ও নীতিহীনতার অন্ধকারে সব তলিয়ে যায়নি।

● কী শিখলে ●

● হূণ ও জার্মান আক্রমণও রোমের অবদানকে টিকিয়ে রেখেছিল।

- জার্মানদের রোম সাম্রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস ও উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদান, মানব মিশ্রণ, সভ্যতার মিলন, খ্রীষ্ট ধর্মের শান্ত প্রভাব।
- মধ্যযুগ একেবারে অন্ধকার যুগ নয়—শিক্ষাদীক্ষা, সেবা ও নীতিবোধ খ্রীষ্টধর্ম ও মঠ বাঁচিয়ে রেখেছিল।

অনুশীলনী

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) জার্মানরা ইউরোপের কোন অঞ্চলে বসবাস করত?

(খ) হূণেরা কখন জার্মানদের উপর আক্রমণ করে?

(গ) ইউরোপে আক্রমণকারী হূণদের কী নামে অভিহিত করা হোত?

(ঘ) জার্মানরা কোন জাতির অন্তর্গত?

(ঙ) জার্মানদের আদি জীবিকা কি ছিল?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) জার্মানরা কীভাবে রোম সাম্রাজ্যে বসবাস শুরু করেছিল?

(খ) জার্মানদের সামাজিক/রাজনৈতিক/সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা কর।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) হূণদের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।

খ) রোম সাম্রাজ্যের কী কী অবদান ছিল?

গ) জার্মান অভিবাসীগণ ইউরোপের কোথায় কোথায় বসতি স্থাপন করেছিল?

ঘ) জার্মানরা কিভাবে রোম সভ্যতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল?

ঙ) ইউরোপের মধ্যযুগকে 'অন্ধকার যুগ' না বলার তাৎপর্য কী?

৪। হূণেরা ছিল– পাঠান জাতির শাখা/আরব জাতির শাখা/মোঙ্গল জাতির শাখা/জার্মান জাতির শাখা।

(খ) ট্যাসিটাসের লেখা বইয়ের নাম– জার্মানীয়া/গীতাঞ্জলি/পথের পাঁচালী/বাইবেল।

৫। তীর চিহ্ন দিয়ে দুটি স্তম্ভের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করঃ

হূণ	ফ্রাঙ্ক
রাইন নদীতীর	জার্মান সংগঠন
হান্ড্রেড	ইংল্যান্ড
স্যাকসন	কাস্পিয়ান সাগর

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

● বাইজানটাইন সভ্যতা ●

সূচনা ঃ

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন রোম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেল তখন প্রকৃত পক্ষে তার পশ্চিম অংশটি ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব অংশ টিকে ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগের রাজধানী ছিল রোম, আর পূর্ব ভাগের রাজধানী ছিল বাইজানটিয়াম– বর্তমান কনস্ট্যান্টিনোপল (১ নং মানচিত্র দেখ)। বাইজানটিয়ামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পূর্ব রোম সাম্রাজ্যই হল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য টিকে ছিল। এই সাম্রাজ্যে যারা বাস করত তারা ছিল বিভিন্ন জাতির মানুষ। তাদের ভাষা ও ধর্ম ছিল বিভিন্ন। অথচ তাদের মধ্যে মিলেমিশে থাকার ইচ্ছা ছিল। তাদের একতার একমাত্র ভিত্তি ছিল এক সম্রাটের শাসন। ফলে বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে।

সম্রাট কনস্টান্টাইন (৩০৬-৩৩৭ খ্রীঃ) ঃ কনস্ট্যান্টিনোপলের পত্তন ও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসার ঃ

গ্রীক বণিকরা বাইজানটিয়ান শহরটি প্রতিষ্ঠা করে। এটি ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ স্থলে। বসফরাস প্রণালীর তীরে উহা অবস্থিত ছিল। প্রথমে এর জলবায়ু ছিল অস্বাস্থ্যকর। ফলে এই শহরটির কোন উন্নতি হয়নি। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে রোমের সম্রাট ছিলেন **কনস্টানটাইন**। তিনি বাইজানটিয়ামে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পরে তাঁর নাম থেকেই এই শহরের নাম হয় **কনস্ট্যান্টিনোপল**। বাইজানটিয়ামে রাজধানী স্থানান্তর করার পেছনে তিনটি কারণ ছিল। প্রথমত, বাইজানটিয়াম রোম সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ভালোভাবে চালু করার জন্য তার রাজধানীর কেন্দ্রীয় অবস্থান দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত, বাইজানটিয়াম থেকে সিরিয়া, আর্মেনিয়া প্রভৃতি সীমান্তের উপর নজর রাখা যেত। এই সময়ে এই অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। তৃতীয়ত, রোমে

গণতান্ত্রিক প্রভাব বাড়ছিল বলে সেখানে সম্রাটের একচ্ছত্র ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পাচ্ছিল। এই সব কারণেই কনস্টানটাইন রোম থেকে তাঁর রাজধানী বাইজানটিয়ামে সরিয়ে আনেন।

রাজধানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কনস্টানটাইনের আরেকটি কৃতিত্ব তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। **তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ধর্মকে সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।** ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খ্রীষ্টধর্মকে স্বীকৃতি দেন। ফলে ইউরোপের সভ্যতায় নতুন যুগ শুরু হয়। এতদিন যে ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল তা হল পেগান ধর্ম বা আদিম ধর্ম। রোমান সম্রাটরা ছিলেন পৌত্তলিক। কিন্তু কনস্টানটাইনের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার পর থেকেই খ্রীষ্টধর্ম রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে থাকে। ফলে পেগান ধর্মের প্রভাব কমতে থাকে। জার্মানরাও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এইভাবে সমগ্র ইউরোপে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশ গড়ে ওঠে। এটি তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান (৫২৭-৫৬৫ খ্রীঃ) ঃ

জাস্টিনিয়ান ছিলেন পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের শাসক জাস্টিনের পোষ্যপুত্র। ৫২৭ সালে সম্রাট জাস্টিন পরলোকগমন করলে জাস্টিনিয়ান শাসন-কার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাস্টিনিয়ানের স্বপ্ন ছিল রোম সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা। এক কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। তাঁর



জাস্টিনিয়ান

সুযোগ্য সহকর্মী ও রণনিপুণ সেনাপতি বেলিসারিয়াস তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সেনাপতির সহযোগিতায় জাস্টিনিয়ান একটি শক্তিশালী সেনা ও নৌবাহিনী গঠন করেন। এই বিরাট বাহিনীর সাহায্যেই বেলিসারিয়াস উত্তর আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডাল রাজ্য ধ্বংস করে কার্থেজ জয় করেন। ৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোম জয় করেন। ইটালী থেকে অস্ট্রোগথ ও স্পেন থেকে ভিসিগথদেরও বিতাড়িত করা হয়েছিল। বেলিসারিয়াস শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাইশ বছর যুদ্ধ করেছিলেন। এই দুর্ধর্ষ বীর দিগ্বিজয়ী হয়েও শেষ পর্যন্ত সম্রাটের বিরাগভাজন হন। তাঁকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করা হয়। মৃত্যুর দু'বছর আগে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তিও ফিরে পেয়েছিলেন।

জাস্টিনিয়ান আইন ঃ

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে নানাবিধ মানুষ বাস করত-হরেক রকম জাতি, বিষম রীতি-নীতি, বিভিন্ন আইন, বিচিত্র সমাজব্যবস্থা। এই সবকিছুকে একটা ঐক্যের মধ্যে বেঁধে রাখার দরকার ছিল। জাস্টিনিয়ান এই সমস্ত আইন ও রীতিনীতিকে বিধিবদ্ধ করেন। এই বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ইতিহাসে **জাস্টিনিয়ানের আইন** নামে পরিচিত হয়ে আছে। এতদিন ধরে রোমের আইন-কানুন, আইনজ্ঞদের মতামত ও বিচারকদের বিচারপদ্ধতি নানা জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে সমস্যাগুলির আইনের মাধ্যমে মীমাংসা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছিল। এই জটিলতা থেকে মুক্তি দিয়ে জাস্টিনিয়ান আইনকে সরল ও সুসংবদ্ধ করেন। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপে এই আইন টিকে ছিল। ট্রিবোনিয়ান নামে এক আইনবিদ্ এই আইনকে লিখে রাখতে সাহায্য করেছিলেন। জাস্টিনিয়ানের রোম জয়ের পর এই আইন ইটালীতে চালু হয় এবং সেখান থেকে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

বাইজানটাইন শিল্প ও সংস্কৃতি ঃ

জাস্টিনিয়ান ছিলেন স্থাপত্যশিল্প ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক। ফলে তাঁর রাজত্বকালে শিল্পকলার ক্ষেত্রে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য চরম উন্নতির শিখরে উঠেছিল। সুবর্ণযুগের সূত্রপাত তখনই হয়। সাম্রাজ্যের সর্বত্র

রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছিল। প্রাসাদ, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার ও উপাসনাগৃহ গড়ে উঠেছিল। কনস্টানটাইন কনস্ট্যানটিনোপলে **সেন্ট সোফিয়া গির্জা** নির্মাণ করেছিলেন। পরে আগুনে পুড়ে এই গির্জার ক্ষতি হয়। জাস্টিনিয়ান এই গির্জার পুনর্নির্মাণ করান। স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে এটিই তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

জাস্টিনিয়ানের সময়ে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের প্রতিটি গৃহস্থের ঘরই ছিল এক একটি বয়নশিল্প কেন্দ্র। এছাড়া, সূচীশিল্প, কারুশিল্প ইত্যাদি প্রায় ঘরোয়া শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এছাড়া, বাইজানটাইন মিনার কাজ ও মোজাইক শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। **কাঁচের উপর নানান রং মাখানো হোত। পাথরের উপর খোদাই করে সেই বর্ণময় কাঁচ দিয়ে নক্সা তৈরি করার নাম হল মোজাইক।** এই আমলে দেশে ছিল প্রচুর সম্পদ আর মানুষের হাতে ছিল বাড়তি সময়। এর ফলে এক উন্নত শিল্পরুচি গড়ে ওঠে। শহরে উদ্যানের আড়ম্বর, গৃহের জাঁকজমক, রঙের জৌলুস ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য চোখে পড়ত। মোজাইক, সোনা-রূপা খচিত কাজের বাহার ও কারুশিল্পের চাকচিক্যও দর্শকদের মুগ্ধ করত। কনস্ট্যানটিনোপলের রাজপ্রাসাদ, গির্জা, মনোরম অট্টালিকা, স্নানাগার ও বিজয়স্তম্ভ তখন প্রায় প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

রাজপ্রাসাদের শীর্ষে ছিল যন্ত্রচালিত ঘড়ি। ভেতরে ছিল ফোয়ারা, স্বর্ণখচিত গাছ। মুক্তাখচিত ফুল-ফল-পাখি। আর ছিল সুন্দর পোষাক পরিহিত সুঠাম ও বলিষ্ঠ প্রহরীর দল। এত আড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রাসাদ ও রাজসভা তখনকার দিনে আর কোথাও ছিল না।

বাইজানটাইন চিত্রশিল্পীদের দক্ষতা তখন জগদ্বিখ্যাত ছিল। তাঁরা গির্জার দেওয়ালে খ্রীষ্টের জীবনকাহিনী, বাইবেলের উপাখ্যান ও খ্রীষ্টান সাধুদের চরিত্র চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করতেন। এতে খ্রীষ্টধর্মের প্রসার হয়েছিল ও মানুষের মনে রুচিবোধ বেড়েছিল। আসলে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। দুই মহাদেশের সংস্কৃতির নির্যাসটুকু এই সাম্রাজ্য গ্রহণ করেছিল। এই সংস্কৃতি সমন্বয় থেকে নতুন বিদ্যাচর্চা দেখা দিয়েছিল। তার কেন্দ্র ছিল কনস্ট্যানটিনোপল, অ্যান্টিয়ক, এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়াতে অবস্থিত

চারটি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তরে। এইভাবে পশ্চিম ইউরোপে যখন সভ্যতার জৌলুষ কমে গিয়েছিল, তখন সভ্যতার আলোক জ্বালিয়ে রেখেছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। এইখানে ছিল এই সাম্রাজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাইজানটাইন বাণিজ্য ঃ

বাইজানটাইন সভ্যতার উন্নতির পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল, তার শিল্প ও বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার। কনস্ট্যানটিনোপল ছিল তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র। উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে তখন তার বাণিজ্য চলত। মিশর থেকে আসত খাদ্যদ্রব্য, ভারতবর্ষ থেকে মশলা, রত্ন, মৃগনাভি ও চন্দনকাঠ। আফ্রিকা থেকে আনা হত হাতির দাঁত, সোনা ও ক্রীতদাস। এছাড়া, আমদানি করা হত শস্য, পশম, মধু, মোম ও মূল্যবান পাথর। আর রপ্তানি করা হত সূক্ষ্ম বস্ত্র, কাঁচ ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা দ্রব্য। আবার ধাতু, অলঙ্কার, সূচীশিল্প, কারুশিল্প ও কাঁচশিল্পের নানা জিনিসও রপ্তানি হত। এই সময়ে রোমে রেশমের কাপড়ের চাহিদা বেড়েছিল। রেশম আসত চীন থেকে। চীনের একচেটিয়া কারবার বন্ধ করার জন্য সম্রাট জাস্টিনিয়ান চীন থেকে তুঁতের বীজ ও গুটি পোকার ডিম আনার ব্যবস্থা করেন। শোনা যায় যে, দু'জন খ্রীষ্টান সাধু চীন থেকে গোপনে তা নিয়ে আসেন। ফলে গ্রীস ও সিরিয়াতে রেশমের চাষ আরম্ভ হয়।

রোমান সংস্কৃতির সংরক্ষণ ঃ

জার্মানদের আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তখন বাইজানটাইন সাম্রাজ্য গ্রীক ও রোমান শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার চর্চা এখানে অব্যাহত ছিল। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও রাষ্ট্র বিষয়ের এখানে চর্চা হত, আবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, আইন, চিত্রকলা, স্থাপত্য ও বিজ্ঞানেরও চর্চা হত। আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইপেশিয়া নামে দর্শনশাস্ত্রের একজন অধ্যাপিকা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রুশ, বুলগেরিয়া, ইটালী, পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে অনেক মানুষ

এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। ফলে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে নানা মানবজাতির মহামিলন ঘটতে পেরেছিল। মানবজাতির অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারও এখানে সংরক্ষিত হয়েছিল। কনস্ট্যান্টিনোপলের গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান পুঁথি রাখা হয়েছিল। দেশ-দেশান্তরের পণ্ডিতরা তা পাঠ করতে এ শহরে আসতেন। পুঁথিগুলি চমৎকার করে বাঁধানো ছিল। পৃষ্ঠাগুলিতে নিপুণ চিত্রশিল্পীদের আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি থাকত। বাইজানটাইন সভ্যতার উন্নতির মূলে ছিল সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা, বাণিজ্যের উন্নতি ও সম্পদের প্রাচুর্য।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন ঃ

উন্নতির আড়ালে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে পতনের লক্ষণগুলি ক্রমশ দেখা যায়। জাস্টিনিয়ানের পরবর্তী সম্রাটগণ হয়ে পড়েন বিলাসপ্রিয় ও অকর্মণ্য। ফলে শাসন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়। আর জনগণের মনে জাগে উত্তেজনা। ধর্মমত ও আচার পদ্ধতি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি প্রদেশগুলি নিজ নিজ ধর্মকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করে। ধর্ম নিয়ে খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু পোপের সঙ্গে সম্রাটদের বিরোধ ঘটে। ফলে সমস্ত খ্রীষ্টান জগৎ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—একদিকে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে গ্রীক ধর্ম সমাজ, আর অন্য দিকে ইটালী ও পশ্চিম ইউরোপে ক্যাথলিক ধর্ম সমাজ। এরই মধ্যে খ্রীষ্টান সমাজ ক্রুসেডের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য অনেকদিন ধরেই অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়েছিল। এমত অবস্থায় দুর্বল হয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যের উপর আসে আরব ও সেলুজক তুর্কীদের আক্রমণ। ১৪৫৩ সালে অটোমান তুর্কীদের আক্রমণে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটে। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যও লোপ পায়।

● কী শিখলে ●

● বাইজানটিয়াম বিভিন্ন মানবজাতির মহামিলন কেন্দ্র, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে সুশাসনই দেশে ঐক্য ও উন্নতি ঘটাতে পারে। আবার, নানা কারণে উহার পতন ঘটে।

- কনস্টানটাইন ও জাস্টিনিয়ান ছিলেন সফল সম্রাট।
- বাইজানটিয়াম আইন, শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য, সংস্কৃতি নানাদিকে উন্নতি করে এবং রোমের ভাবধারাকে বাঁচিয়ে রাখে।

অনুশীলনী

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

ক) বাইজানটিয়ামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন— রোমুলাস/ কনস্টানটাইন/ অডোয়েকার/ভিসিগথ।

খ) ইউরোপের প্রাচীন ধর্মকে বলা হোত— খ্রীষ্টধর্ম/পেগান ধর্ম/হিন্দুধর্ম/ইসলাম ধর্ম।

গ) জাস্টিনিয়ান আইনকে সঙ্কলিত করেছিলেন— ট্রিবোনিয়ান/ বেলিসারিয়াস/রোমুলাস/ ট্যাসিটাস।

ঘ) সেন্ট সোফিয়া গির্জা তৈরি করেন— হাইপেশিয়া/ভ্যাণ্ডাল গোষ্ঠী/ফ্রাঙ্ক গোষ্ঠী/জাস্টিনিয়ান।

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) পূর্ব রোম সাম্রাজ্য কতদিন টিকে ছিল?

খ) বাইজানটিয়ামের নাম কনস্ট্যান্টিনোপল হবার তাৎপর্য কী?

গ) কোন রোম সম্রাটের আমলে খ্রীষ্টধর্ম স্বীকৃতি পায়?

(ঘ) তুর্কীরা কত সালে কনস্টান্টিনোপল দখল করে?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) পূর্ব রোম সাম্রাজ্যকে 'বাইজানটিয়াম সাম্রাজ্য' বলা হয় কেন?

খ) জাস্টিনিয়ানের শাসক হিসাবে প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) বাইজানটিয়ামে রাজধানী স্থানান্তরিত করার কারণ কী ছিলেন?

খ) সম্রাট কনস্টানটাইনের প্রধান প্রধান কার্যাবলী বর্ণনা কর।

গ) বোলিসারিয়াসের প্রধান কৃতিত্ব কী আলোচনা কর।

ঘ) 'জাস্টিনিয়ান আইনের' মূল দিকগুলির পরিচয় দাও।

ঙ) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের শিল্প-সংস্কৃতি/অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দাও।

চ) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে রোমের সংস্কৃতির সংরক্ষণ কিভাবে হয়েছিল?

ছ) বাইজানটিয়ামে নানা জাতের লোকের বাস সত্ত্বেও কেন উন্নতি হয়েছিল?

জ) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি লিখ।

৫। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর ঃ

ক) জাস্টিনিয়ান কনস্ট্যানটিনোপলে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

খ) কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্মকে স্বীকৃতি দেন।

গ) মিনার ও মোজাইক কাজের জন্য বাইজানটাইন সাম্রাজ্য বিখ্যাত ছিল।

ঘ) হাইপেশিয়া আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ছিলেন।

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

● ইসলাম ও তার প্রভাব ●

আরব দেশ ও তার অধিবাসী ঃ

পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও দক্ষিণে আরব সাগর বেষ্টিত আরব দেশ। মানচিত্রে দেখ, উহা পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ। কিন্তু এই বিশাল ভূখণ্ডের উপকূল ভাগের এক চতুর্থাংশ বাদে বাকী চার ভাগের তিনভাগই মরুভূমি। এই দেশের কাছেই প্রাচীনকালে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও ফিনিশীয় সভ্যতার আবির্ভাব ঘটে। আরব দেশের মরু অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল যাযাবর। তারা 'বেদুইন' নামে পরিচিত ছিল। তাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। তারা উট আর ঘোড়ায় চড়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করত। লুঠতরাজ ও খুন-জখম ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তারা ছিল কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও দুর্ধর্ষ। অন্যদিকে, লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল উর্বর হওয়ায় এখানে জনবসতি স্থাপিত হয়। এখানকার অধিবাসীরা কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করত। সেখানে মক্কা ও মদিনা নামে দুটো শহরও গড়ে উঠে।

নগরের অধিবাসী আরব ও মরু অঞ্চলের বেদুইনদের মধ্যে আচার-ব্যবহারে ও ধর্মবিশ্বাসে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তারা নানা কৌমে (গোত্রে) বিভক্ত ছিল। কয়েকটি জ্ঞাতি পরিবার নিয়ে এক একটি কৌম গড়ে ওঠে। প্রতি কৌমের একজন করে নেতা ছিল। তাকে **শেখ** বলা হত। এক কৌমের সঙ্গে অপর কৌমের ঝগড়াঝাটি ও সংঘর্ষ প্রায়ই লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে ঐ সংঘর্ষ কয়েক বছর ধরে চলত। দেশে কোন শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না। সমাজে হত্যার বদলে হত্যার নীতিই প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে দেশ ও জাতিকে ভালবাসার কোন চেতনাও ছিল না। পুরুষের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। নারী ও পুরুষ খুব উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করত। আরবরা নানা দেবদেবীর পূজা করত। এমন কি গাছ, পাথর, নদী, গুহা, কূপ ইত্যাদিও তাদের উপাস্য ছিল। প্রত্যেক কৌমের নিজস্ব দেবতা ছিল। প্রধান ধর্মস্থান হিসাবে মক্কার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। মক্কার জম্‌জম্ কূপের জল এই স্থানকে আকর্ষণীয়

করে তোলে। আরবরা এই জল পবিত্র মনে করত। মক্কার কাবা মন্দিরে বহু দেবদেবী ও একটি কালো পাথর ছিল। পবিত্র মনে করে আরবরা তাদের পূজা করত। এখানে তীর্থযাত্রীদেরও আগমন ঘটত। উৎসবের সময়ে বড় মেলাও বসত। ওকাজ নামক স্থানে তারা সবাই মিলিত হয়ে খেলাধূলা, অস্ত্র ও তীর চালনা, কুস্তি ও কাব্য প্রতিযোগিতায় মেতে উঠত। মক্কা শহর এক বাণিজ্য কেন্দ্র রূপেও গড়ে উঠে। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এই শহরের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাণিজ্য উপলক্ষে আরব বণিকরা বিদেশেও যেত। এই উপলক্ষে তাদের সঙ্গে খ্রীষ্টান ও পারস্য দেশের যোগাযোগ হয়। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পারসিক ধর্মমতের সঙ্গে তাদের পরিচয়ও ঘটে। এমনকি, সমুদ্র পথে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। আরব সাগর অঞ্চলে তাদের আধিপত্য ছিল বেশী।

কিন্তু হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবের প্রাক্কালে প্রায় এক হাজার বছর ছিল আরব জাতির অন্ধকার যুগ'। কোরআন শরীফে ঐসময়কে "আইয়ামে জাহেলিয়াৎ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে আরব জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধঃপতন চরমে পৌঁছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে হজরত মহম্মদ ও ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব আরব ইতিহাসে এক তাৎপর্যময় ঘটনা।

হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ)—তাঁর জীবন ও বাণী :

মক্কার কাবাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক কোরায়েশ বংশে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের পূর্বেই পিতা আব্দুল্লাহ ও জন্মের কিছু পরেই মাতা আমিনার মৃত্যু হয়। ফলে পিতৃব্য আবু তালেব অনাথ মহম্মদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেজন্য শৈশবে মহম্মদ প্রথাগত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হন। কিন্তু পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে এবং যৌবনে মক্কার খাদিজা নামে জনৈকা ধনী বিধবার বাণিজ্য পরিচালনার কারণে সিরিয়া সহ আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। ঐসব দেশে তিনি নানা জাতির মানুষের সংস্পর্শে এসে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে হিংসা ও হানাহানি বন্ধ করা ও নারীর সম্মান রক্ষার জন্য তিনি একটি শান্তি সেবা কমিটি গঠন করেন।

মহম্মদের কর্মদক্ষতা ও সততায় মুগ্ধ হয়ে খাদিজা তাঁকে পতিরূপে বরণ করেন। এইভাবে জীবনযাপনের অসুবিধা দূর হওয়ায় অধিকাংশ সময় তিনি মক্কার কাছে হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহ-র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। চল্লিশ বছর বয়সে এইখানে একদিন তিনি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহ-র বাণী লাভ করেন। যার মূল কথা ছিল 'আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নাই', এবং মহম্মদ তাঁর রসুল বা বাণীবাহক।' তারপর তিনি তাঁর নবলব্ধ ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নানা দেব-দেবী, গাছ, পাথর ইত্যাদি পূজার অসারতার কথা বলেন। একমাত্র নিরাকার আল্লাহের উপাসনা করার বাণী তিনি প্রচার করতে থাকেন।

হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত এই নবধর্ম **ইসলাম** নামে অভিহিত। এই নবধর্মে প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন হজরত পত্নী খাদিজা। পরে একে একে আবুবকর, জামাতা হজরত আলী, ও গৃহভৃত্য জায়েদ এই নতুন ধর্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্মের প্রতি যখন ধীরে ধীরে অনেকে দীক্ষিত হতে থাকল, তখনই শুরু হল মহম্মদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এই নবধর্মকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য মহম্মদের নিজ গোত্র কোরায়েশরাই নেতৃত্ব গ্রহণ করে। কারণ, ইসলাম ধর্ম কেবল কোরায়েশদের পিতৃপুরুষের চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেয় তাই নয়, ইসলাম প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে পবিত্র কাবায় তীর্থানুরাগীর ভিড় কমতে থাকে। তাদের বিপুল পরিমাণ তীর্থকর থেকে প্রাপ্ত আয়ে টান পড়ে। ফলে মহম্মদ ও তাঁর সহযাত্রীদের ওপর আঘাতের মাত্রা এত তীব্র হয়ে উঠল যে, আত্মরক্ষার স্বার্থে মহম্মদকে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা ছেড়ে মদিনায় আশ্রয়গ্রহণ করতে হয়। তাঁর এই মদিনা গমন আরবী ভাষায় 'হিজরত' নামে পরিচিত। তাই ঐদিন থেকে 'হিজরী' সাল গণনা করা হয়।

প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে যাঁরা মহম্মদের সঙ্গে মদিনায় আসে তাঁদের 'মুহাজির' (বাস্তুত্যাগী) বলা হত। আর মদিনায় যাঁরা মহম্মদ ও তাঁর অনুগামীদের আশ্রয়দান করেন, ধর্মপ্রচারে সাহায্য করেন তাঁদের 'আনসার' (সাহায্যকারী) বলা হত। তাঁদের উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে মহম্মদ এক 'ভ্রাতৃ সংঘ' স্থাপন করেন। মুসলমান ও ইহুদীরা যাতে শান্তিতে মদিনায় বসবাস করতে পাবে তার

জন্য মহম্মদ একটি সনদও প্রদান করেন। তাকে **'মদিনা সনদ'** বলা হয়।

মদিনায় প্রচারিত ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করায় মক্কার কোরায়েশরা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তারা মহম্মদের প্রভাব হ্রাস করতে অগ্রসর হয়। কোরায়েশদের সঙ্গে মহম্মদের প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। বদরের যুদ্ধে মহম্মদ জয়ী হন। ওহোদের যুদ্ধে মহম্মদের সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু কোরায়েশ সৈন্যরা এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, তারা মদিনা আক্রমণ করে অথবা ওহোদের উপত্যকা থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেনি। কোরায়েশরা মক্কায় ফিরে যায়। অবশেষে **'হোদাইবিয়ার সন্ধি'** অনুযায়ী উভয় পক্ষই পরবর্তী দশ বছর শত্রুতা ও যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত হয়। কিন্তু কোরায়েশরা এই সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করায় মহম্মদ তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। কোরায়েশরা পরাজিত হয়। বিজেতা হিসেবে মহম্মদ মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁর ধর্ম প্রচারে আর কোন প্রতিকূলতা রইল না। মক্কার অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সমগ্র আরব দেশে এই ধর্মের প্রসার ঘটে। বিভিন্ন কৌমে বিভক্ত অধিবাসীরা এক ধর্মসূত্রে আবদ্ধ হয়। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের মৃত্যু হয়।

মহম্মদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি পর্ণ কুটিরে বাস করতেন। নিজের হাতে ছেঁড়া পোশাক সেলাই করতেন। তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী হয়েও পোত্তলিকদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। পরাজিত শত্রুর সাথে সবসময়ই উদার ব্যবহার করতেন। এমনকি জোর করে ধর্মান্তরিত করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। শিক্ষার প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলতেন "শিক্ষার জন্য যদি সুদূর চীন দেশে যেতে হয়, তাহলে যেও।"

ইসলাম শব্দের এক অর্থ হল শান্তি ; অন্য অর্থ হল আত্মসমর্পণ। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণই ইসলামের মূল কথা। এর দ্বারাই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁরা এই ইসলাম ধর্ম মেনে চলেন, তাঁরাই মুসলমান। মুসলমানদের যে কয়েকটি কর্তব্য পালন করতে হয় তা হল : (১) কলেমা পড়তে হবে অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপর

বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে; (২) প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ (প্রার্থনা) পড়তে হবে ; (৩) প্রতি বছর রমজান মাসে রোজা (উপবাস) পালন করতে হবে; (৪) সঙ্গতি আছে এমন মুসলমানকে তার আয়ের ২১/২ ভাগ দুঃস্থদের জাকাত (দান) দিতে হবে ; (৫) আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য থাকলে অন্তত একবার মক্কায় হজ (তীর্থ) করতে যেতে হবে। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের আগে যে সব শাস্ত্রের বাহক ও মহাপুরুষ অর্থাৎ বার্তাবাহক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তাঁদের প্রতি ইসলাম শ্রদ্ধা ও সম্মান সমান ভাবেই প্রদর্শন করে। কোরআন শরীফে এ ধরনের বহু ধর্মপ্রচারক ও নবীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হজরত মহম্মদ ছিলেন নিরক্ষর। তিনি বিভিন্ন সময় আল্লাহ-র কাছ থেকে যে সব অহী বা 'প্রত্যাদেশ' পেতেন তারই সংকলন হল কোরআন বিভিন্ন প্রয়োজনে বা সাহাবাদের (সঙ্গী) প্রশ্নের জবাবে তাঁর দেওয়া উপদেশাবলীর সংকলনকে বলা হয় **'হাদিস'**। এই দুই গ্রন্থে ইসলামের মূল নীতিগুলি লিপিবদ্ধ আছে। এই দুই পবিত্র গ্রন্থের নির্দেশানুসারে মুসলমানদের ধর্মীয় ও পার্থিব জীবন পরিচালিত হয়।

ইসলাম ধর্মের প্রসারের কারণ ঃ

ইসলাম ধর্ম আরব জাতির মধ্যে ঐক্য এনেছিল। তাছাড়া, মুসলমান মাত্রই মুসলমানের ভাই, মুসলমান মাত্র এক আল্লাহ-র উপাসক--এই বাণীর মধ্যে ছিল এমন এক সংকল্প ও শক্তি যা ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূর--পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। ইসলামের সরল ধর্মমত, সুবিচার ও সাম্যের আদর্শ এবং সহনশীলতার নীতি মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করত। তাছাড়া, গরীব, দুঃখী ও ঋণী ব্যক্তিদের ধনী মহাজনদের শোষণের হাত থেকে মুক্তির পথ সাধারণ মানুষদের আকৃষ্ট করেছিল। খ্রীষ্টীয় সম্রাটদের অধীনে করভারে জর্জরিত মানুষ নিষ্কৃতি পাবার জন্য অনেক সময় ইসলামকে স্বাগত জানাত। 'জিজিয়া' থেকে মুক্তি পাবার জন্য কেউ বা ইসলামের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিত। এসব কারণে মহম্মদের মৃত্যুর একশ' বছরের মধ্যে ইসলাম এক বিশ্বধর্মে পরিণত হয়।

খলিফাদের শাসন ঃ

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য খলিফা পদের সৃষ্টি হয়। 'খলিফা' কথার অর্থ প্রতিনিধি; এরা ধর্ম ও রাষ্ট্রের রক্ষক ও প্রচারক। আরব সমাজে নেতৃত্বপদ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যেত না। তাই গোষ্ঠীপতিদের সমর্থনের ভিত্তিতে মহম্মদের প্রিয় সহচরদের (সাহাবা) মধ্য হতে পর পর চারজন খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁরা হলেন হজরত আবুবাকর (৬৩২-৬৩৪ খ্রীঃ), হজরত ওমর(৬৩৪-৬৪৪ খ্রীঃ), হজরত ওসমান (৬৪৪-৬৫৬ খ্রীঃ) ও হজরত আলি (৬৫৬-৬৬১ খ্রীঃ)। ইসলামের ইতিহাসে এই চারজন খলিফা 'খোলাফায়ে রাশেদীন' বা ধর্মপ্রাণ খলিফা নামে পরিচিত। তাঁরা সবাই ছিলেন মহম্মদের আত্মীয় ও প্রিয় সহচর।

প্রথম চারজন খলিফা ঊনত্রিশ বছর (৬৩২-৬৬১ খ্রীঃ) আরবদের ধর্ম ও রাজনীতি পরিচালিত করেছিলেন। প্রথম তিন খলিফা মদিনা থেকে শাসন করতেন। চতুর্থ খলিফা আলি থাকতেন বর্তমান ইরাকের কুফা শহরে। ৬৬১ খ্রীঃ আলির মৃত্যুর পর মোয়াবিয়া খলিফা পদ দখল করে উমাইয়া রাজবংশের (৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের রাজধানী ছিল বর্তমান সিরিয়ার দামাস্কাসে। মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এজিদ খলিফা হয়ে হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বীরের ন্যায় যুদ্ধ করেও ইমাম হোসেন তাঁর দুই শিশুপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সহ কারবালার মরুপ্রান্তরে মৃত্যু বরণ করেন। এই মর্মান্তিক শোকের স্মৃতি বহন করে মুসলমানরা আজও পরম শ্রদ্ধার সাথে মহরম উৎসব পালন করে থাকেন। উমাইয়া বংশের পর পাঁচশ বছরেরও বেশি (৭৫০-১২৫৮ খ্রীঃ) আব্বাস বংশীয় সুলতানরা খলিফার আসন দখল করেছিলেন। তাঁদের রাজধানী ছিল বর্তমান ইরাকের রাজধানী বোগদাদ শহরে। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের আমলে আরব সভ্যতা চরম উন্নতি লাভ করে। এই বংশের খলিফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন আরব্য উপন্যাসের অবিস্মরণীয় নায়ক খলিফা হারুন-উর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ)। ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকে তাঁর রাজধানী বোগদাদ ছিল সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ নগরী। ঐ যুগের আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের

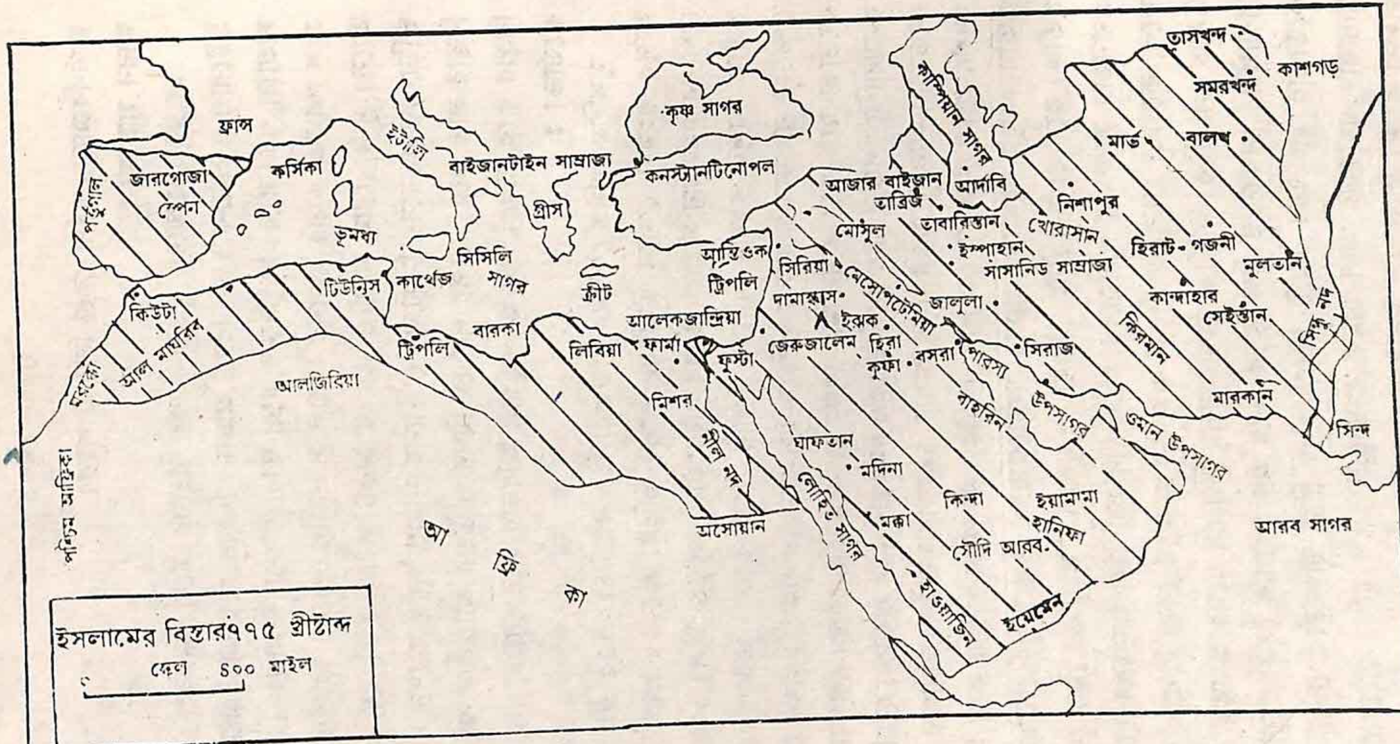
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কেন্দ্র ছিল ঐ শহর।

আরব সাম্রাজ্য ঃ

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যে আরবরা এশিয়া-ইউরোপ ও আফ্রিকার এক বিরাট অঞ্চল অধিকার করে এক বিরাট আরব সাম্রাজ্য গঠন করে। কিছুদিনের মধ্যে তারা কনস্ট্যান্টিনোপল-এর দ্বারে এসে আঘাত করে। ইরানের বিশাল সাম্রাজ্যও তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। দুর্বল রোম সম্রাটও তাদের নিকট পরাস্ত হয়। মধ্য এশিয়া ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশ ও চীনের সীমান্ত পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। এরপর পশ্চিমে মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করে তারা স্পেন ও পর্তুগাল অধিকার করে নেয়।

কর্ডোভা ঃ

মুসলিম শাসিত স্পেনের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। ৭৫৫ খ্রীঃ প্রথম আব্দুর রহমান স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে স্পেনের মুসলমান সাম্রাজ্য আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ৯২৯ খ্রীঃ তৃতীয় আব্দুর রহমান খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। এরপর থেকে স্পেনের খলিফারাই হলেন পশ্চিমে ইসলামের রক্ষাকর্তা। এখন থেকে কর্ডোভা হয়ে ওঠে ঐসলামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। বোগদাদ ও কনস্ট্যান্টিনোপলের ন্যায় কর্ডোভাকেও চমৎকার করে সাজানো হয়েছিল। কর্ডোভার অসংখ্য সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, চমৎকার মসজিদ, স্নানাগার এবং সুদৃশ্য, প্রশস্ত রাজপথ বোগদাদ নগরীর জৌলুসকেও ম্লান করে দিত। তৃতীয় আব্দুর রহমানের প্রাসাদ 'আলজোহরা' ছিল অপূর্ব সৌন্দর্য্যের প্রতীক। কর্ডোভা ছিল খ্রীষ্টান, ইহুদী ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র। এখানকার মুসলমান শাসকদের ধর্মীয় উদারতা ছিল অনুকরণ যোগ্য। ফলে, কর্ডোভা সে যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছিল। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। সেখানে ৪ লক্ষ পুস্তক নিয়ে এক গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছিল। কর্ডোভার মত আর একটি বিদ্যাচর্চা ও শিল্প স্থাপত্যের কেন্দ্র ছিল গ্রানাডা। এখানকার আল হামরা প্রাসাদ ছিল সে যুগের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি। আলহামরা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার



ইসলামের বিস্তার ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ

কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। এ ছাড়া, মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আরব সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এরও অনেক পরে।

ইসলামের সাফল্যে ইউরোপের প্রতিক্রিয়া ঃ

ইসলামের উত্থানের ফলে ভূমধ্যসাগরের চারদিকে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বহিরাগত শক্তির চাপ প্রতিহত করার মত শক্তি তখন ইউরোপের ছিল না। কারণ, এর কয়েক শতাব্দী আগেই বর্বর হূণ ও জার্মান জাতিগুলির আক্রমণে ইউরোপীয় সভ্যতার বনিয়াদ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপ তখনও সম্পূর্ণভাবে নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সংহতিকে জাগিয়ে তুলতে পারেনি। ফলে অগ্রসরমান ইসলামীয় সভ্যতার চাপে ইউরোপীয় জীবনের কেন্দ্রভূমি ভূমধ্যসাগর থেকে আরও উত্তরে সরে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভূমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব আরবদের আয়ত্তে আসে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ায় রোমের পোপকে বর্বরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে পোপ জার্মান ফ্রাঙ্ক্‌দের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে এগিয়ে এলেন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ শার্লাম্যানকে সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করে পুরাতন রোম সাম্রাজ্য ও তার ঐক্যকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

বিশ্বসভ্যতায় আরবদের দান ঃ

বিশ্বসভ্যতায় আরবদের অবদান উল্লেখযোগ্য। হজরত মহম্মদের বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় আরবদের মধ্যে জ্ঞান আহরণের আকাঙ্খা দেখা দেয়। ইসলামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারা সভ্যতায় উন্নত দেশগুলির সংস্পর্শে আসে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা বিজিত প্রাচীন জাতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। গ্রীক, রোম, চীন, পারসিক, ইহুদী, হিন্দু প্রভৃতি জাতির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করার ফলে আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘটে। আরব পণ্ডিতদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি, তাঁরা ইউরোপে গুরুর পদেও অধিষ্ঠিত হন। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের শাসনকালে আরব সভ্যতার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। তখন বোগদাদ ছিল জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র। ভারত ও বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতরা আমন্ত্রিত হয়ে বোগদাদে আসতেন এবং তাঁরা ফারসী, সিরীয়, গ্রীক, হিব্রু,

সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় রচিত পুঁথি আরবি ভাষায় অনুবাদ করতে সাহায্য করতেন। বোগদাদে গবেষণাগার, মানমন্দির ও গ্রন্থাগার ছিল। বিদ্যাচর্চার জন্য স্পেনের কর্ডোভারও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

শুধু মাত্র জ্ঞান আহরণ নয়, জ্ঞান বিতরণেও আরবদের ভূমিকা ছিল। পণ্যসম্ভার নিয়ে তারা বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত। একই সঙ্গে তারা দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডারও বহন করে নিয়ে যেত। তার ফলে জ্ঞানের প্রসার ঘটে। ভারতের দশমিক চিহ্ন, সংখ্যা, বীজগণিত ও দোলক তো আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে প্রসারিত হয়। এমনকি, এ্যরিস্টটল ও প্লেটোর দর্শন এবং গ্রীক বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র আরবি অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপের শিক্ষিত মহল জানতে পারে। রসায়ন শাস্ত্রও উন্নত হয়। আলজেবুর বীজগণিতকে সমৃদ্ধ করেন। চীনের কাছ থেকে শিখে আরবরাই ইউরোপে কাগজ তৈরির পদ্ধতি প্রচলিত করে। তার ফলে গ্রন্থ ছাপানো সম্ভব হয় এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটি আরো প্রসারিত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'আরব্য রজনী' তাঁদের এক অমর সৃষ্টি। ভারতের পঞ্চতন্ত্রের গল্পের অনুবাদ আরবী ভাষায় করা হয়।

আরব মনীষী ঃ

আরব পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করা হল। আরবি ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদের কাজে হুনিয়ন ইবন ইশাক দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ইরানের বাসিন্দা আল তাবারি (৮৩৮-৯২৩ খ্রীঃ) বহু বছর ধরে পরিশ্রম করে বিশ্ব ইতিহাস রচনা করেন। তাতে তিনি ৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করেন। তিনি পবিত্র কোরআন গ্রন্থের টীকা লিখে এই গ্রন্থ পাঠে সহায়তা করেন। বোগদাদের অধিবাসী পর্যটক আল মাসুদি বিশ্বকোষ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। মধ্যএশিয়ার আফসনা অঞ্চলের বাসিন্দা ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রী) কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর রচিত চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপে সমাদৃত ছিল। কর্ডোভার বাসিন্দা আভেরাস বা ইবন রুশদ এ্যরিস্টটলের ভাষ্যকার ছিলেন। ইবনে খালদুন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন। মধ্যএশিয়ার বাসিন্দা আলবেরুণী (৯৭৩-১০৪৮

খ্রীঃ) বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় জীবনের নানা দিকের উপর ইতিহাস রচনা করেন। মরক্কোর অধিবাসী পর্যটক ইবনে বতুতার রচনায় সেকালের বহু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতে আসেন এবং বিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন। আল গাজ্জালীও ছিলেন সে যুগের একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি।

● কী শিখলে ●

- ইসলাম ধর্মের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সাধারণ, শোষিত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ আরবদেশে সভ্যতার জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে ঐ সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে।
- হজরত মহম্মদের নেতৃত্বে মদিনা সনদ, হোদায়রিয়ার সন্ধি ইসলামের শান্তির আর্দশকে তুলে ধরে এবং আরবে একতা আনে। তারা জাতি হিসাবে গড়ে ওঠে।
- পারস্য, রোম সাম্রাজ্য দূর্বল হয়ে পড়লে আরব সভ্যতা তাদের জায়গা পূরণ করে ও কর্ডোভা, দামাস্কাস ও বোগদাদে সভ্যতার পুর্ণজন্ম দেখা যায়।
- আরব সভ্যতা গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন ও ভারত সভ্যতার নানা দানে পরিপুষ্ট হয়েছে। সে যুগের মণীষিরা সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক বীজগণিত, দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, দোলক ও নানা বিষয়ে বিশ্ব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে।
- ইসলাম ধর্মের মূল কথা-- এক ঈশ্বরে (আল্লায়) বিশ্বাস, দৈনিক পাঁচবার প্রার্থনা, রোজার মাসে উপবাস, জাকাত দান ও হজযাত্রা। তাছাড়া, শোষণের হাত থেকে সর্বহারাদের মুক্তি, দাসদের মুক্ত করা, নারীর মর্যাদা ইত্যাদি। কোরআন ও হাদিস ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি।

অনুশীলনী

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) আরব দেশের পশ্চিমে অবস্থিত -- লোহিত সাগর/আরব সাগর/ বঙ্গোপসাগর/ভারত মহাসাগর।

(খ) হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন -- ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে/৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে/৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে/৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

(গ) হিজরী সাল গণনা শুরু হয় – হজরতের তায়েফ গমন থেকে/আবিসিনিয়া গমন থেকে/মদিনায় গমন থেকে/বদর যুদ্ধ থেকে।

(ঘ) আনসার বলা হয় -- ইহুদীদের/মদীনাবাসীদের/মক্কাবাসীদের/খ্রীষ্টানদের।

(ঙ) খলিফা হলেন -- ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি/মক্কার প্রতিনিধি/মদীনার প্রতিনিধি/মক্কা ও মদীনার প্রতিনিধি।

(চ) কর্ডোভার সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল -- হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিলন /খ্রীষ্টান ও গ্রীক সভ্যতার মিলন/পার্শী ও হিন্দু সংস্কৃতির মিলন/খ্রীষ্টান, ইহুদী ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলন।

(ছ) ইসলাম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল – তায়েফ/বোগদাদ/গজনী/আবিসিনিয়া।

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) আরব দেশের অধিকাংশ স্থলভূমি কী ধরনের ?

(খ) মরুভূমির অধিবাসীদের কী বলা হয় ?

(গ) জম্‌জম্‌ কী ?

(ঘ) ভারতের সঙ্গে আরবদের কোন সূত্রে পরিচয় হয়?

(ঙ) হজরত মহম্মদ বাণিজ্য উপলক্ষে কোথায় গিয়েছিলেন ?

(চ) তিনি কত বছর বয়সে আল্লার বাণী লাভ করেন ?

(ছ) মুহাজির কাদের বলা হয় ?

(জ) জাকাত কাকে বলে ?

(ঝ) মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থের নাম কী ?

(ঞ) হোদায়রিয়ার সন্ধির প্রধান গুরুত্ব কী ?

(ট) প্রথম খলিফা কে ছিলেন ?

(ঠ) উমাইয়া শাসনকালে রাজধানী কোথায় ছিল ?

(ড) হারুন-উর-রশিদ কে ছিলেন?

(ঢ) কর্ডোভা কোথায় অবস্থিত ছিল ?

(ণ) আলহামরা কী জন্য বিখ্যাত ছিল ?

(ত) আল তাবারি/আল মাসুদি/ইবনে সিনা/আল বিরুনী/ইবনে রুশদ কী জন্য বিখ্যাত?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) বেদুইন চরিত্র কেমন ছিল ?

(খ) বাইরের দেশের সঙ্গে আরবদের কিভাবে পরিচয় ঘটে ?

(গ) আইয়ামে জাহেলিয়াত কি?

(ঘ) 'শেখ' কাকে বলে ?

(ঙ) ইসলামের মূল আদর্শ কী ?

(চ) 'হিজরত' কেন ঘটে ?

(ছ) মদীনা সনদের গুরুত্ব কোথায় ?

(জ) মহরম কী ?

(ঝ) খোলাফায়ে রাশেদীন কাদের বলে?

(ঞ) বোগদাদ কীভাবে সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়েছিল ?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(ক) আরবের অধিবাসীদের সামাজিক ও ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় দাও।

(খ) হজরতের মদীনা জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(গ) হজরতের চরিত্র বর্ণনা কর।

(ঘ) ইসলামের প্রসারের কারণগুলি কী ছিল ?

(ঙ) কর্ডোভা কী জন্য বিখ্যাত সংক্ষেপে লিখ।

(চ) বিশ্বসভ্যতায় আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান/সাহিত্য ও ইতিহাসে অবদানের পরিচয় দাও।

৪। শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও :

(ক) হজরত মহম্মদ মক্কা ও মদীনা বাসীদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য — প্রতিষ্ঠা করেন।

(খ) ইসলাম --- ও --- আল্লার প্রতি বিশ্বাস করে।

(গ) প্রথম খলিফা ছিলেন — ।

(ঘ) স্পেনের কর্ডোভা ছাড়া সংস্কৃতির অন্য কেন্দ্র ছিল — ।

(ঙ) আরবরা ভারতের কাছ থেকে — — — শিখেছিল।

(চ) গ্রীকদের কাছ থেকে --, --- ও চীনের কাছ থেকে — তৈরির পদ্ধতি শেখে।

৫। বাঁ পাশের ঘটনা/ব্যক্তির সঙ্গে ডান পাশের ঘটনা/ব্যক্তিকে মেলাও ঃ

বেদুইন	উৎসব
ওকাজ	ওসমান
তৃতীয় খলিফা	হজরত মহম্মদের মৃত্যু
৬৩২ খ্রীঃ	মরু অঞ্চলের আরববাসী
দশমিক চিহ্ন	মুহম্মদ বিন তুঘলক
চীন	আলতাবারি
ইবনে বতুতা	কাগজ
বিশ্ব ইতিহাস	ভারত

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

● মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ●

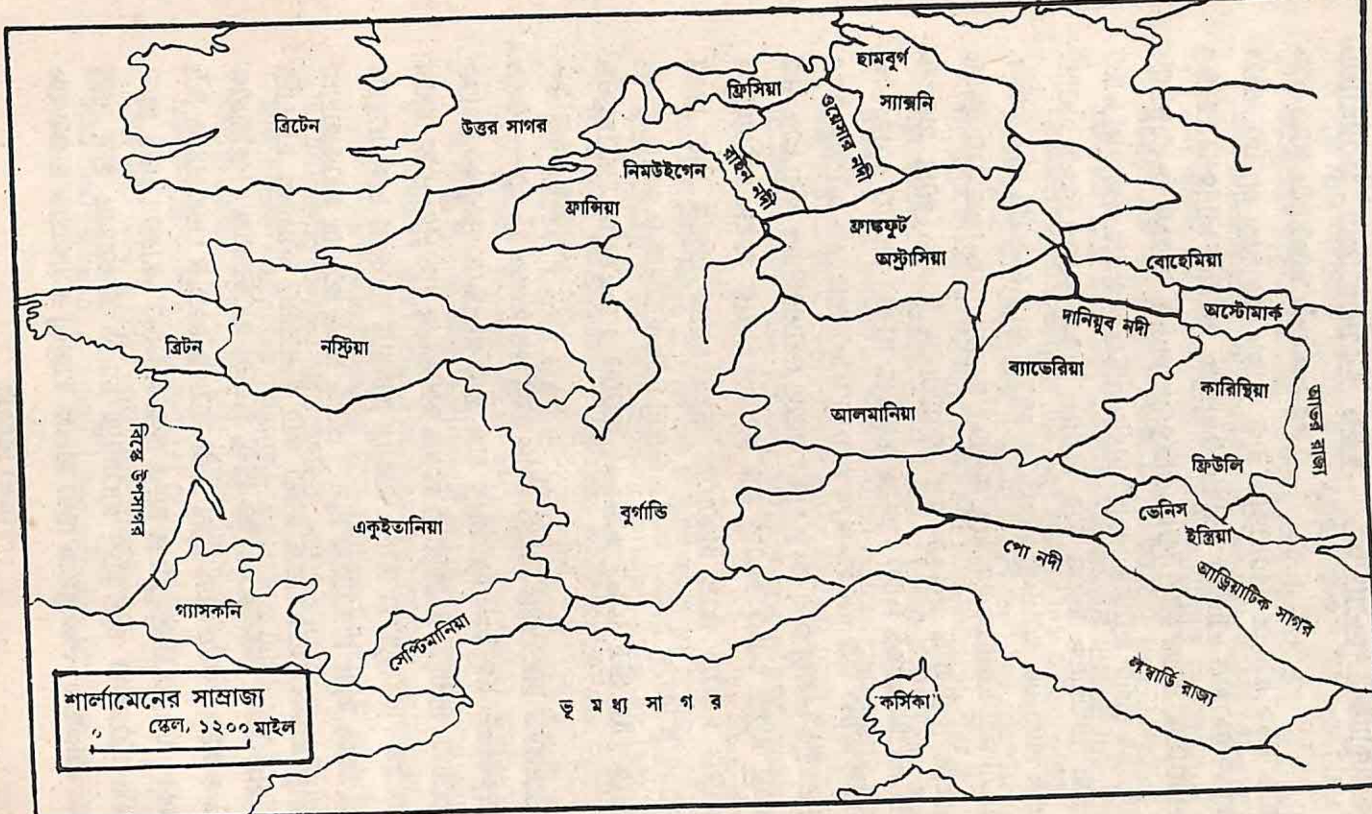
(৮০০- ১২০০ খ্রীঃ)

সূচনা ঃ

পশ্চিম ইউরোপে জার্মান জাতিগুলির আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর কোন ঐক্যবদ্ধ বড় সাম্রাজ্য আর রইল না। যেখানেই জার্মান জাতিগুলি বসতি স্থাপন করেছিল সেখানেই তারা তাদের আঞ্চলিক আধিপত্যকে বজায় রেখে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলে। জার্মান জাতিগুলির একটি শাখা ছিল **ফ্রাঙ্ক**। তারা রোমান সাম্রাজ্যের **গল** প্রদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। সেখানে তারা একটি রাজ্য গড়ে তোলে। তার নাম **ফ্রাঙ্কিয়া**। এই রাজ্যই পরবর্তীকালে ফ্রান্স নামে পরিচিত হয়।

শার্লাম্যান (৭৬৮-৮১৪ খ্রীঃ) ঃ ফ্রান্সের রাজা ছিলেন **ক্লোভিস** (Clovis)। তিনি প্রায় তিরিশ বছর (৪৮১-৫১১ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কয়েকটি জার্মান জাতিকে পরাজিত করে একটি শক্তিশালী রাজ্যের বনিয়াদ তৈরী করেন। ক্লোভিসের মৃত্যুর পর রাজার প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় **নগরাধ্যক্ষ** বা **মেয়রদের** হাতে। এই রকম একজন ক্ষমতাশালী মেয়র ছিলেন **চার্লস মার্টেল**। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে **তুরের যুদ্ধে** তিনি মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, চার্লস মার্টেলই পশ্চিম ইউরোপের প্রথম সফল ব্যক্তি যিনি খ্রীষ্ট সভ্যতাকে ইসলামের দ্রুত প্রসার থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। চার্লস মার্টেলের পুত্র ছিলেন মেয়র পিপিন। তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পিপিনের পুত্র হলেন **শার্লাম্যান**। তিনি ৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িক ইউরোপে তাঁর মত বলশালী ও সুদক্ষ শাসক আর কেউ ছিল না। তিনি শুধু সমরকুশলী সেনানায়ক বলেই খ্যাতিলাভ করেননি, খ্রীষ্টধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক ও জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান ঃ জার্মানদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পরও রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতি জনগণের মন থেকে মুছে যায়নি। সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে শার্লাম্যান বিলুপ্ত রোম


শার্লামেনের সাম্রাজ্য
স্কেল, ১২০০ মাইল
ব্রিটেন
উত্তর সাগর
ফ্রিসিয়া
হামবুর্গ
স্যাক্সনি
ওয়েসার নদী
রাইন নদী
নিমউইগেন
ফ্রান্সিয়া
ফ্রাঙ্কফুর্ট
অস্ট্রাসিয়া
বোহেমিয়া
অস্টোমার্ক
দানিয়ুব নদী
ব্রিটন
নস্ট্রিয়া
ব্যাভেরিয়া
কারিন্থিয়া
আলমানিয়া
আভার রাজ্য
বিস্কে উপসাগর
ফ্রিউলি
একুইতানিয়া
বুর্গান্ডি
ভেনিস
ইস্ত্রিয়া
পো নদী
আড্রিয়াটিক সাগর
গ্যাসকনি
সেপ্টিমানিয়া
লম্বার্ডি রাজ্য
ভূ ম ধ্য সা গ র
কর্সিকা

সাম্রাজ্যের কাঠামোকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের ভেতর খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তিকেও জোরালো করার চেষ্টা করেন। রোমের পোপকে রক্ষা করার জন্য তিনি লম্বার্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য তিনি স্যাক্সনদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন। অ্যাভারদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন একই কারণে। ড্যানিয়ুব অঞ্চলকে নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা করে সেখানে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের যাত্রাকে সহজ করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র ধর্মপ্রচারক পাঠিয়ে তিনি প্রজাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে ধর্মের বন্ধনে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে বাঁধতে চেয়েছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের কাঠামোকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আর খ্রীষ্টধর্মের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো—এই দুই ঘটনার মধ্য দিয়ে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

শার্লাম্যানের অভিষেক ঃ রোমের বিশপকে পোপ বলা হয়। খ্রীষ্টান সমাজ অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত হলেও পোপই ছিলেন খ্রীষ্টধর্মের নেতা এবং খ্রীষ্টীয় চার্চের ধর্মীয় অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক। শার্লাম্যানের সময়ে খ্রীষ্টধর্মজগতের গুরু ছিলেন পোপ তৃতীয় লিও। তাঁর সঙ্গে ছিল বার্বারিয়ানদের বিরোধ। তার উপর লিও ছিলেন কটূভাষী। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শার্লাম্যান পোপ লিওকে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করে তাঁকে রোমের গির্জায় প্রতিষ্ঠিত করেন। পোপ বুঝতে পারেন যে, ক্ষমতায় টিকে থাকতে শার্লাম্যানের মত একজন শক্তিশালী রাজার সমর্থন প্রয়োজন। শার্লাম্যানেরও পোপের স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। সেই বছর ২৫শে ডিসেম্বর যীশু খ্রীষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে শার্লাম্যান যখন রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জায় নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছিলেন, তখন পোপ লিও অকস্মাৎ তাঁর মাথায় প্রাচীন রোমান সম্রাটের একটি স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দেন। সমবেত জনগন মহাউল্লাসে ধ্বনি দিতে থাকে 'শার্লাম্যান ঈশ্বরের প্রতিনিধি পোপের 'অভিষিক্ত সম্রাট'। এইভাবে ফ্রাঙ্কদের নৃপতি হলেন রোমের অভিষিক্ত সম্রাট। তাঁর অভিষেকের মাধ্যমে ৩২৪ বছর পরে রোম সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান হল।

শার্লাম্যানের রাজ্যভিষেকের গুরুত্ব-- শার্লাম্যানের রাজ্যাভিষেক

ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বর্বর আক্রমণের ফলে ইউরোপে যে ধ্বংস ও নৈরাজ্যের কাল শুরু হয়েছিল তার শেষ হল। নতুন করে শুরু হল আবার সংহতি ও নির্মানের যুগ। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম ইউরোপের মানুষদের মনে একটা ধারণা ছিল যে, রোম সাম্রাজ্য আবার গড়ে উঠবে। সে ধারণা আবার বাস্তবে রূপায়িত হল। যদিও একজন ফ্রাঙ্ক সম্রাটের অধীনে পশ্চিম ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হল। পোপের সঙ্গে সম্রাটের বন্ধুত্বের ফলে খ্রীষ্টানদের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ফিরে এল।

শার্লাম্যানের রাজ্যাভিষেক যতই মহৎ ঘটনা হোক না কেন, তার মধ্যে ভবিষ্যৎ বিবাদের একটি বীজ লুকিয়েছিল। রাজাকে অভিষিক্ত করে পোপ দেখাতে চেয়েছিলেন রাজশক্তি থেকে ধর্মশক্তি অনেক বড়। সম্রাটের উপরে পোপের স্থান। কারণ সম্রাটের মুকুটও পোপের দান, পোপ ছাড়াও সম্রাটের অভিষেক অসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে সম্রাটরা এ দাবীকে অস্বীকার করায় পোপ ও সম্রাটের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ দেখা দেয়। সম্রাটের অভিষেক নিয়ে এ দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছিল বলে এর নাম অভিষেক দ্বন্দ্ব।

রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের সম্পর্ক ঃ ঐহিক জগতের শাসক যেমন রাজা বা সম্রাট সেইরকম ধর্মীয় জগতের শাসক হলেন পোপ। ধর্মের সংগঠন হল চার্চ, আর চার্চের প্রধান হিসাবে পোপের কর্তৃত্বের এলাকা হল **প্যাপাসি** বা পবিত্র 'সি' (Holy See) । পোপ রোমে থাকতেন। সেখানে তাঁর প্রাসাদ ও চারপাশের অঞ্চলটিকে বলা হত ভ্যাটিক্যান। পোপের প্রতিনিধি হিসাবে প্রত্যেক দেশে থাকতেন একজন আর্চবিশপ, আর্চ বিশপের অধীনে অনেক বিশপ এবং প্রত্যেক বিশপের অধীনে অনেক ধর্মযাজক। শার্লাম্যান তাঁর রাজ্যের প্রত্যেক বিশপ ও আর্চ বিশপদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। রাজা হিসাবে চার্চের উপর তিনি তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম রেখেছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সম্রাট স্বয়ং তার মীমাংসার ব্যবস্থা করে দিতেন। খ্রীষ্টধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শার্লাম্যান যেমন যুদ্ধ করেছিলেন, সেই রকম তার অভ্যন্তরীণ সংহতিকে বজায় রাখার জন্য তিনি কঠোর হাতে তার নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাই তাঁর সময়ে ধর্মতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্র নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হয়েছিল। এই নিবিড়তা

থেকে জন্ম নিয়েছিল এই ধারণা যে, শার্লাম্যানের রাজ্য আসলে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র

অভিষেক দ্বন্দ্ব ঃ ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শার্লাম্যানের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে সম্রাটের সঙ্গে পোপের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। সম্রাটকে মুকুট পরিয়েছিলেন পোপ। অতএব তিনিই বড়। এই দাবী যেই উঠল, অমনি সম্রাট সজাগ হলেন। পোপকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সম্রাট। অতএব সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া পোপের ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। এই দাবী যখন পেশ করা হল, তখন পোপও নিজের অধিকার রক্ষায় কঠোর হলেন। অর্থাৎ অধিকারের দাবী নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হল। অভিষেকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই পরস্পর বিরোধী দাবী উত্থাপিত হয়েছিল বলে এই দ্বন্দ্বের নাম **অভিষেক দ্বন্দ্ব**। অভিষেক দ্বন্দ্ব আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় একটি চুক্তির মাধ্যমে। ১১২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর জার্মান সম্রাট **পঞ্চম হেনরী ও পোপ দ্বিতীয় ক্যালিক্সটাস (Calixtus II)**। ওয়ার্মস্‌-এর চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পোপের প্রতিনিধি বিশপকে কে অভিষিক্ত করবে এই ছিল দ্বন্দ্বের বিষয়। এই চুক্তির ফলে অভিষেকের অধিকার পোপের হাতেই রইল, কিন্তু বিশপরা সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য রাজার কাছে দায়ী রইলেন। চার্চের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির উপর রাজার নিয়ন্ত্রণ কমল, কিন্তু চার্চ তার অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্য রাজার কাছে নির্ভরশীল হয়ে রইল।

শিল্প-সাহিত্যের বিকাশে রাজসভার দান ঃ শার্লাম্যানের সময়ে তাঁর রাজধানী আখেন নগরী (বর্তমানের এইক্স-লা-শ্যাপেল শহর) জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল। সম্রাট নিজে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ। তিনি আখেনের রাজপ্রাসাদে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেখানে শিক্ষকতা করতেন দুই প্রথিতযশা শিক্ষক। একজন হলেন ব্রিটিশ পণ্ডিত **আলকুইন**, আরেকজন হলেন ঐতিহাসিক **পল-দ্য-ডিকন**। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতেন সম্রাটের পত্নী, তাঁর পুত্র-কন্যাগণ এবং রাজপ্রাসাদের বিপুল সংখ্যক কর্মচারী ও তাদের সন্তান-সন্ততিরা। সম্রাট নিজেও কখনো কখনো এই বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষালাভ করতেন। সম্রাটের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আকর্ষণ ছিল বলে

সমস্ত দেশেই একটা বিদ্যাচর্চার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্রাঙ্কদের অতীত গাথা লিপিবদ্ধ হয়। ল্যাটিন ও জার্মান ব্যাকরণ সংকলিত হয়, আর নতুন করে রচিত হয় ইতিহাস। শার্লাম্যানের জীবনীকার **আইনহার্ড** (৭৭০-৮৪০ খ্রীঃ) লিখেছেন যে, সম্রাট খ্রীষ্টান মঠগুলিকে বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেন। এর ফলে নানা অঞ্চলে মঠকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বড় বড় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যা প্রসারের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পুস্তকের অনুলিপি করানোর ব্যবস্থা করেন এবং বহু ভোজনালয় ও পানশালাকে বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। এই সমস্ত কাজের ফলে জনগণের মধ্যে একটা শিক্ষার অনুরাগ গড়ে ওঠে। রাজপ্রাসাদের মধ্যেও একটা শিক্ষার বাতিকে সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, শার্লাম্যানের শাসনকালে বিদ্যাচর্চার নতুন দরজা খুলে যায়। তাঁর যশ দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। **তাঁর সঙ্গে মিত্রতা করতে চান** স্পেনের মুসলমান নায়ক আল হাকাম, বাইজান্টাইনের রাজা আইরিন এবং বোগদাদের খলিফা হারুন-উর-রশীদ ঐতিহাসিকরা শার্লাম্যানকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম মনে করেন। তাঁকে যুগ পরিবর্তনের নায়ক, নতুন সভ্যতার অগ্রদূত বলেও চিন্তা করা হয়। **তাঁর যুগে জ্ঞানের যে স্ফুরণ হয়েছিল তাকে ক্যারোলিঞ্জিয় রেনেশাঁস বলা হয়।** রেনেশাঁস কথার অর্থ নবজাগরণ। বর্বর আক্রমণে ম্লান হয়ে আসা খ্রীষ্টীয় সভ্যতার বাতিকে নতুন করে জ্বালিয়ে দিয়ে জনগণের মধ্যে সংস্কৃতির নবজাগরণ ঘটানো হয়েছিল বলে এর নাম রেনেশাঁস। **এই রেনেশাঁসের দুটি শ্রেষ্ঠ ফসল হল আইনহার্ডের লেখা শার্লাম্যানের জীবনী এবং পল-দ্য-ডিকনের লেখা লম্বার্ডদের ইতিহাস।**

: খ্রীষ্টীয় মঠ :

মনাস্টারি : পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিম ইউরোপকে দিয়েছিল এক রাজনৈতিক ঐক্য। ধর্মের ক্ষেত্রে এই ঐক্য এনেছিল খ্রীষ্টান চার্চ। মনাস্টারি হল মঠ। মঠের প্রধান বাসিন্দা ছিলেন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা। তারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে নির্জনে ঈশ্বর সাধনা ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন। দান-ধ্যান-আরাধনা ও বিদ্যাসাধনা

এই ছিল তাদের প্রধান চারটি কাজ। তাঁরাই খ্রীষ্টের বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দিতেন। মঠবাসী সন্ন্যাসীদের বলা হত মঙ্ক। (Monk) আর সন্ন্যাসিনীদের বলা হত নান। তাঁরা অবশ্য আলাদা মঠে থাকতেন। মঙ্ক ও নান ছাড়াও মঠে থাকতেন একজন মোহান্ত। তাঁকে বলা হত অ্যাবট (Abbot)।

চতুর্থ শতাব্দীতে সেন্ট অ্যামানাসিয়াস রোমে নতুন করে মনাস্টারির নিয়মাবলী রচনা করেন। কিন্তু এত কঠোরতা সত্ত্বেও সন্ন্যাসীদের জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে অলসতা ও হীনতা দেখা দিয়েছিল। এই মুহূর্তে ইটালীর বিখ্যাত সন্ন্যাসী সেন্ট বেনেডিক্ট (৪৮০-৫৪০ খ্রীঃ) মঠবাসী সন্ন্যাসীদের জন্য কঠোর আচরণবিধি তৈরী করলেন। এই আচরণ-বিধিই ইতিহাসে বেনেডিক্ট বিধি নামে পরিচিত। এই বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে দৈনিক অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, কৃষিকাজ, বইয়ের অনুলিখন, নিজের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ, ধ্যান, উপাসনা ইত্যাদি কাজ করতে হত। এই কঠোর কর্মসূচির ফলে সন্ন্যাসীদের জীবন থেকে আলস্য ঘুঁচে গেল। তাঁরা মঠাধ্যক্ষ অ্যাবটের অনুশাসন নতশিরে মানতে বাধ্য হলেন। এর ফলে মনাস্টারিগুলিতে শৃঙ্খলা ফিরে এল। মঠের জীবন হল পবিত্র, ভদ্র ও অনাড়ম্বর।

জ্ঞানের সংরক্ষণ ও প্রসারে মঠের ভূমিকা ঃ মধ্যযুগে ইউরোপে মঠগুলিই ছিল শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র। সন্ন্যাসীদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিলেন শিক্ষিত ব্যক্তি। যতদিন পর্যন্ত না বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব হয় ততদিন পর্যন্ত মঠগুলিই শিক্ষার বাতিকে জ্বালিয়ে রেখেছিল। পরবর্তীকালে মঠের পাঠ্যসূচির অনুকরণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মঠের সন্ন্যাসীরাই ছিলেন ইউরোপের শিক্ষক। বেনেডিক্টের নিয়ম অনুযায়ী তারা জীবন যাপন করতেন। তাছাড়া, ইউরোপের ধ্রুপদী সাহিত্য (Classical literature) ও ল্যাটিন ভাষাও মঠের ভেতরে চর্চা করা হত। তার সঙ্গে ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, গণিত, সমাজতত্ত্ব, ভূগোল এবং ভক্তিগীতের চর্চা করা হত। এর ফলে অনেক প্রাচীন পুস্তক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং রচিত হয় অনেক নতুন বই (যেমন ভিলেহারদুইন রচিত চতুর্থ ক্রুসেডের ইতিহাস ও জোয়াভিল রচিত

সেন্ট লুইসের জীবনী)। পর্যটকরা প্রায়ই মঠে আসতেন। সেখানে তাঁরা সেই সব সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে আসতেন যাঁরা গ্রীক, রোমান ও আরবীয় জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করেছিলেন। সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সেই জ্ঞানের উপাদান গ্রহণ করে পর্যটকরা তা সমাজে ছড়িয়ে দিতেন। ইউরোপের অনেক মঠ ছিল চিকিৎসা কেন্দ্র। ফলে মঠের থেকে শিক্ষার আলো সাধারণভাবেই জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। এইভাবে, মধ্যযুগের ইউরোপের মঠগুলি জ্ঞানের সংরক্ষণ ও জ্ঞানের বিস্তারের কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছিল।

ক্লুনির মঠ ঃ দশম শতাব্দীতে আবার মনস্টারিগুলির অধঃপতন ঘটতে থাকে। মঠের নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে এবং অন্যায় ও দুর্নীতির পরিবেশ মঠের জীবনকে পঙ্কিল করে তোলে। মঠের সন্ন্যাসীরা পুনরায় ত্যাগ ও সেবার আদর্শ থেকে সরে আসেন। সবচেয়ে বড় কথা মঠের ভূ-সম্পত্তি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। সামন্ততান্ত্রিক বিধি অনুসারে এই ভূ-সম্পত্তি পরিচালিত হতে থাকে। মঠের সন্ন্যাসীরা রাজনৈতিক প্রভুদের অনুসরণে সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার কাজে মন দেন এবং শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার কাজে অংশীদার হয়ে পড়েন। এর ফলে মঠগুলি বিত্ত ও ক্ষমতার উৎসে পরিণত হয়।

এই দূষিত পরিবেশ থেকে মঠগুলিকে উদ্ধার করার জন্য পুনরায় আন্দোলন শুরু হয়। এইবার এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল ক্লুনির মঠ থেকে। এই মঠে সন্ন্যাসীদের অধঃপতনের বিরুদ্ধে সংস্কারের এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলে এর নাম **ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন।** (Cluniac Reform Movement) ক্লুনির মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বার্গাণ্ডির ক্লুনি নামক স্থানে। ক্লুনির আন্দোলন মঠের দুর্নীতিকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি। পরে মেণ্ডিক্যান্ট ফ্রায়ার নামে আরেক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী মঠের দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা করেন।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ঃ মধ্যযুগে বিদ্যালয় বলতে বোঝাত মঠ ও গির্জা সংলগ্ন বিদ্যালয়। প্রত্যেক বিশপের শাসন কেন্দ্রে থাকত একটি গীর্জা। তাকে বলা হত **ক্যাথিড্রাল** (Cathedral) প্রত্যেক ক্যাথিড্রালে থাকত একটি বিদ্যালয়। তাকে

বলা হত ক্যাথিড্রাল বিদ্যালয়। সেখানে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ও পড়ানো হত। লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় শিক্ষাই ছিল তাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত। এই সব বিদ্যালয়ে যাজকরাই ছিলেন শিক্ষক। কোথাও কোথাও গ্রামীণ বিদ্যালয় ছিল। নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাদের ভূমিকা কিছু কম ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম।

একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে জ্ঞানচর্চার যে পরিবেশ তৈরী হয়েছিল তাতে দেখা দিল নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরাজি ভাষায় এদের বলা হয় **ইউনিভারসিটি (University)** । এই শব্দটি ল্যাটিন **'ইউনিভারসিটাস'** শব্দ থেকে উদ্ভূত। উচ্চতর ও ব্যাপকতর জ্ঞানের ক্ষেত্র ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। ঐ সময় অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল। বিদ্যার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। নতুন নতুন শহরের পত্তন হয়েছিল। গির্জা ও সামন্তপ্রভুদের ভূ-সম্পতি ও কাজকর্মের তদারকীর জন্য শিক্ষিত কর্মচারী ও আইনবিদদের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত কেউ স্থাপন করত না। কখনো কখনো বিশেষ কোন ক্যাথিড্রালকে কেন্দ্র করে, কখনো কখনো বিশেষ কোন পণ্ডিতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত ছাত্র-শিক্ষক সংঘ, বৃহত্তর শিক্ষার পরিবেশ। এই পরিবেশ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। প্যারিসে **নোটরডাম** গির্জার ক্যাথিড্রেল বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিখ্যাত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছিল । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত **অ্যাবেলার্ড**-কে কেন্দ্র করে নতুন জ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল। প্যারিসের মত ইটালীর একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হল **বলোনা** বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে রোমান আইন ও চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানো হত। ইংল্যান্ডে দ্বাদশ শতাব্দীতে **অক্সফোর্ড** ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে **কেমব্রিজ** বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সম্ভবত ইউরোপের সবচেয়ে পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় হল **স্যালার্ণো** বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ছিল গ্রীক, ল্যাটিন, ইহুদী ও আরব সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র।

বিভিন্ন বিষয়ে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা : ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার ফলে নতুন নতুন বিষয়ে পঠনপাঠন শুরু হয়। তাছাড়া, লিওনস্ ও কিছুকিছু বিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের বাইরে আরও দু'ধরনের

বিষয় পড়ানো হত। এগুলি হল **ট্রিভিয়াম** বা ভাষাতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণ এবং **কোয়াড্রিভিয়াম** বা সঙ্গীত, গণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান। বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আইন, গণিত ও বিজ্ঞানের চর্চাও বাড়তে লাগল। রোমান আইন নতুনভাবে আলোচিত হতে লাগল। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনে স্থিরতা দেখা দিল। অতএব, সাহিত্য, ভাষা ও শিল্পকলার চর্চাও বেড়ে গেল। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হচ্ছিল। তাই সহজেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিকে মানুষের ঝোঁক বাড়ল। নতুন নতুন নগর, গৃহ ও সেতু নির্মাণের কাজ, দুর্গ গঠন ইত্যাদি আরম্ভ হয়েছিল বলে স্থাপত্যবিজ্ঞান খুব জনপ্রিয় হল। মঠে মঠে দর্শন, ভাষা, ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যচর্চা চলেছিল। এর ফলে নতুন জ্ঞানের দিগন্ত খুলে গেল।

কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষী : মধ্যযুগে ইউরোপে **স্কুলমেন** নামে এক ধরনের পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল। এইরকম যুক্তিবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ফরাসী দার্শনিক **পিটার অ্যাবেলার্ড** (১০৭৯-১১৪২ খ্রীঃ)। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কোন বিষয়কে অন্ধভাবে গ্রহণ না করে যুক্তি তর্কের দ্বারা তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন। ফলে যাজকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয় এবং তাঁকে শাস্তিভোগ করতে হয়। মধ্যযুগের বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ছিলেন **অ্যালবার্ট ম্যাগনাস**। তিনি অ্যারিস্টটলের রচনার টীকা লেখেন এবং পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যায় গ্রন্থ লিখে খ্যাতিমান হন। তাঁরই শিষ্য হলেন ইটালীর **টমাস অ্যাকুইনাস**। তিনি প্রথমে প্যারিস এবং পরে নেপলস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন। তিনি আঠারোটি গ্রন্থ লেখেন। ৪৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ও মনস্তত্ত্বে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল।

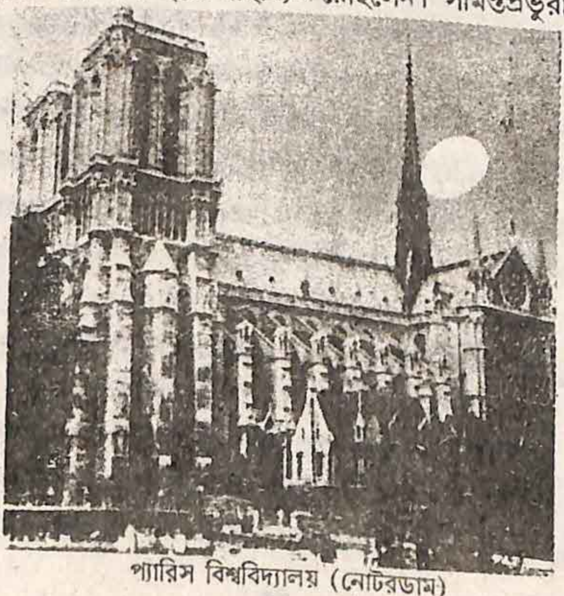
মধ্যযুগে সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক হলেন ইংলন্ডের **রোজার বেকন** (১২১৪-১২৯৪ খ্রীঃ)। তিনি অক্সফোর্ডে শিক্ষাদান করতেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে কোন বস্তুর সম্পর্ক জানার উপর তিনি জোর দিতেন। তাই তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। রসায়নশাস্ত্র পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বারুদ

তৈরীর কৌশল ও অনুবীক্ষণ কাচ আবিষ্কার করেন। অবশ্য এই বিষয়ে চীন আগেই দক্ষতা অর্জন করে।

মধ্যযুগের দুজন সাহিত্যিক হলেন ইটালীর দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ) ও ইংল্যান্ডের চ'সার (১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ)। দান্তের কাব্য ডিভাইন কমেডি, আর চ'সারের কাব্য ক্যান্টারবেরী টেলস্ পৃথিবী বিখ্যাত।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঃ খ্যাতিমান শিক্ষকের আকর্ষণে সে যুগে ছাত্ররা নিজেদের আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে অনেক দূরে শিক্ষালাভ করতে যেত। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই তারা চেষ্টা করত শিক্ষকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। ছাত্ররা শিক্ষালাভের জন্য বেতন দিত, আর সেই বেতন থেকে শিক্ষকরা তাঁদের বেতন লাভ করতেন। ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই তাদের কর্তব্যে মনোযোগী থাকত। সে যুগে ছাপা গ্রন্থ বেশি ছিল না। হাতে লেখা পুঁথি ছাত্রদের পড়তে হত। সে পুঁথি ছিল শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে। অতএব শিক্ষকদের অনুগত থাকাকে ছাত্ররা কর্তব্য মনে করত।

মঠের বাইরে শিক্ষাব্যবস্থা ঃ মঠের বাইরে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন মধ্যযুগের প্রথমদিকে বেশি ছিল না। শার্লামান রাজপ্রাসাদে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এই ব্যবস্থাকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছিলেন। সামন্তপ্রভুরা তাদের



প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় (নোটরডাম)

দুর্গের মধ্যে কখনো কখনো বিদ্যালয় স্থাপন করতেন। এছাড়া, যখন নতুন নতুন শহর পত্তন হতে শুরু করল তখন মঠ ও গির্জার বাইরে বিদ্যালয়ও অধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। সামন্ত প্রভুদের ভূ-সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছিল। তাদের উপযোগী পাঠ্যবিষয় মঠ ও গির্জার বিদ্যালয়গুলিতে না থাকায় অনেক সময়ে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। এইভাবে একটা **ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা** মধ্যযুগে চালু হয়েছিল।

● কী শিখলে ●

- শার্লাম্যানের অভিষেকের মধ্য দিয়ে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পুনর্জন্ম— অভিষেক দ্বন্দ্ব ও তার মীমাংসা।
- শার্লাম্যানের সুশাসনে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা, শিক্ষাদীক্ষা, চার্চের সঙ্গে বন্ধুত্ব, ও রাজসভায় জ্ঞানী গুণী মানুষের সমাবেশ—ক্যারোলিঞ্জীয় রেঁনেসাস—বাইরের রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।
- মঠগুলি বড় বড় শিক্ষার কেন্দ্র--ক্যাথিড্রাল বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়- ধর্ম ও পার্থিব বিষয়ে চর্চা--ট্রিভিয়াম ও কোয়াড্রিভিয়াম--নোটরডাম, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, বলোনা প্রভৃতি--সুন্দর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক।
- মঠের বাইরে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা।
- স্কুলমেন ও মনীষীবৃন্দঃ আইনহার্ড, আলকুইন, অ্যাবেলার্ড, অ্যাকুইনাস, অ্যালবার্ট ম্যাগনাস, চসার, বেকন, দান্তে, পল দ্য ডি কেন।

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

(ক) ফ্রান্স দেশের নাম হয়েছে – গল/গথ/ভ্যাণ্ডাল/ফ্রাঙ্কিয়া থেকে।

(খ) তুরের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজিত করেছিলেন -- চালর্স মার্টেল/শার্লামেন/পোপ লিও/আইন হার্ড।

(গ) শার্লাম্যানের জীবনী লিখেছেন -- রজার বেকন/ইবনে সিনা/আইন হার্ড/পিপিন।

(ঘ) শার্লাম্যানের নেতৃত্বে যে সাম্রাজ্যের পুনর্জন্ম হয় তা হল –

১) পবিত্র রোমের সাম্রাজ্য।

২) ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্য।

৩) ইউরোপীয় সাম্রাজ্য।
৪) পোপের সাম্রাজ্য।

(ঙ) বেনেডিক্ট বিধি রচনা করেন — সেন্ট পল/ সেন্ট বেনেডিক্ট/ সেন্ট অ্যান্টনি/ সেন্ট লুইস।

(চ) ট্রিভিয়াম কথার তাৎপর্য হোল --
১) গণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান।
২) গণিত, ভাষাতত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র।
৩) ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র।
৪) তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও ভূগোল।

(ছ) পিটার আবেলার্ডকে বলা হত — চার্চমেন/ স্কুলমেন/যাজক/ পোপ।

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ ঃ

(ক) অখ্রীষ্টান রাজাদের সঙ্গে শার্লামেনের কী ধরনের সম্পর্ক ছিল ?
(খ) শার্লাম্যানের অভিষেক ক্রিয়া কত খ্রীষ্টাব্দে ঘটে ?
(গ) আলকুইন/পল ডিকেন কিজন্য বিখ্যাত ছিলেন ?
(ঘ) সালার্ণো/বলোনা বিশ্ববিদ্যালয় কিজন্য বিখ্যাত ছিল ?
(ঙ) রোজার বেকন কি ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর জোর দিতেন ?
(চ) চ'সারের/দান্তের লেখা কাব্যের নাম কী ?
(ছ) পোপ ও সম্রাটের মধ্যে অভিষেক দ্বন্দ্ব কত বছর চলেছিল ?
(জ) 'ইউনিভারসিটি' প্রতিষ্ঠানগুলি কী ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল ?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) ফ্রান্সের নামকরণের তাৎপর্য কোথায়?
(খ) শিক্ষা চর্চায় অন্যান্য সভ্যতার প্রতি আরবদের মনোভাব কিরূপ ছিল ?
(গ) অভিষেক দ্বন্দ্ব কী ?
(ঘ) 'বেনেডিক্টের শপথ' কাকে বলে ?
(ঙ) ক্লুনি কী ?
(চ) কোয়াড্রিভিয়াম কথাটির ব্যাখ্যা লিখ।
(ছ) 'স্কুল মেন' কাদের বলা হয় ?
(জ) মঠের বাইরে কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে ?

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) শার্লাম্যানের শাসনকালকে 'ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেশাঁস' বলে বর্ণনা করা হয় কেন ?
(খ) পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান কীভাবে ঘটেছিল ?
(গ) শার্লাম্যানের অভিষেকের তিনটি গুরুত্ব আলোচনা কর।
(ঘ) জ্ঞানের সংরক্ষণ ও প্রসারে চার্চের ভূমিকা লিখ।

(ঙ) ক্লুনি সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

(চ) 'স্কুল মেন' হিসাবে অ্যাবেলার্ড ও অ্যালবার্ট ম্যাগনাসের শিক্ষাপ্রসারে অবদান আলোচনা কর।

(ছ) মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কীরকম ছিল লিখ।

৫। ডান দিকের ঘটনা /ব্যক্তির সঙ্গে বাম দিকের ঘটনা/ব্যক্তির সঙ্গে → তীর চিহ্ন দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন কর।

চার্লস মার্টেল	পোপ
হারুন-উর-রশীদ	অভিষেক দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি
তৃতীয় লিও	প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়
১১২২ খ্রীঃ	তুরের যুদ্ধ
অ্যাবেলার্ড	খলিফা
ক্যান্টারবেরী টেলস্	চ'সার
শার্লামেন অভিষেক	৮০০ খ্রীঃ
নোটরডাম	

।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

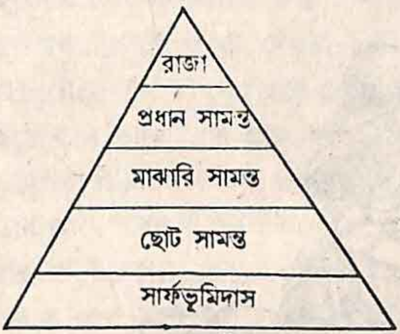
● ইউরোপে সামন্ততন্ত্র ●

সূচনা ঃ রোম সাম্রাজ্যের পতন কিংবা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান যেমন মধ্যযুগের ইউরোপের বড় ঘটনা, সেইরকম বড় ঘটনা হল সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব। **সামন্ততন্ত্র বা ফিউডালিজম (Feudalism)** জমির বিশেষ মালিকানার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ল্যাটিন ফিওডাম (Feodum) শব্দ থেকে ফিউডালিজম শব্দটির উদ্ভব। **হাজার বছরের অধিক সময় ধরে** সামন্ততন্ত্র ইউরোপের জীবন পদ্ধতিতে কায়েম হয়ে ছিল। সম্ভবত, পশ্চিম ইউরোপে ফ্রাঙ্কদের রাজ্যে ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্রের রূপ প্রথম স্পষ্ট হতে থাকে। তারপর ইংল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি, ইটালী ও পূর্ব ইউরোপে তা ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চম শতাব্দী থেকে এর সূচনা। পূর্ণ বিকাশ কাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) 'পর থেকে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র লোপ পায়। আধুনিক যুগে শিল্পবিপ্লবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার শেষ চিহ্নটুকু নিঃশেষ হয়ে যায়।

সামন্ততন্ত্র একটি জীবন পদ্ধতি ঃ সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবে ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনপদ্ধতি বদলে যায়। জার্মানদের আক্রমণের মুখে ইউরোপের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন জনগণ নিজেদের জীবন ও ভূসম্পত্তি রক্ষার জন্য রাজার কাছে আত্মসমর্পণ না করে, বড় বড় ভূস্বামী ও আঞ্চলিক প্রভুদের আশ্রয়ে চলে যায়। এর ফলে রাজার ক্ষমতা ম্লান হয়ে আসে। দেশরক্ষা ও প্রশাসনের ক্ষমতা রাজার অধস্তন বড় বড় আঞ্চলিক প্রভুদের হস্তগত হয়। শাসন করা, সৈন্য রাখা, খাজনা আদায়, দেশের জমি ও রসদের বণ্টন, মানুষের জীবিকা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি সমস্ত কাজ ঐ প্রভুরাই করতে থাকেন। কিন্তু তাদের পক্ষেও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রভুত্ব করা সম্ভব ছিল না। কারণ, বর্বরদের আক্রমণ ছিল অনেক ব্যাপক, মারাত্মক। তাই তারাও তাদের অধীনে দেশরক্ষা ও প্রশাসনের ক্ষমতা বণ্টন করে দিতেন মাঝারি প্রভুদের কাছে। এই মাঝারি প্রভুরা একই নিয়মে তা বণ্টন করে দিতেন

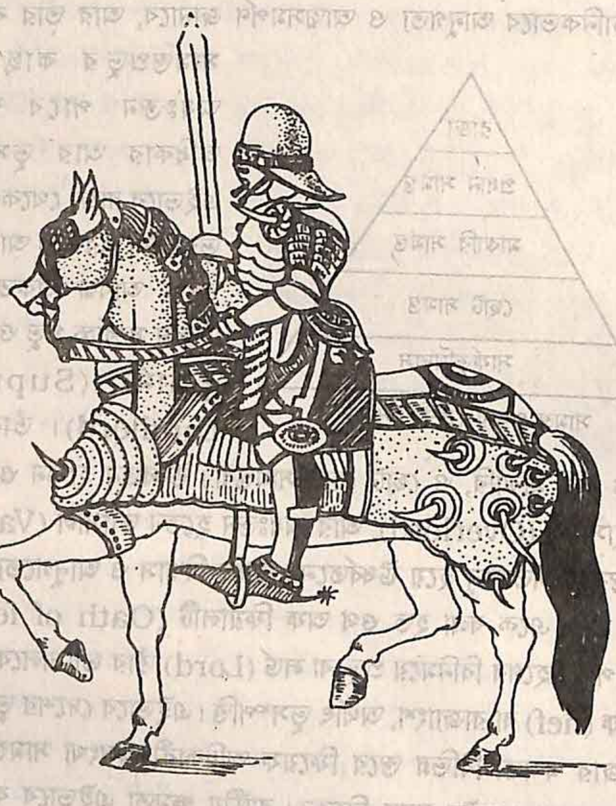
ছোট ছোট অঞ্চলের প্রভুদের কাছে। ফলে রাজা দেশের সর্বেসর্বা হলেও প্রজার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকত না।

জমিভিত্তিক জীবন ও সামাজিক স্তরবিন্যাস : সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি জমিভিত্তিক হয়ে পড়ে। সমাজ জমি ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আসলে সামন্ততন্ত্রের আদর্শ ছিল খুব সরল—শীর্ষস্তরের সামন্তের কাছে অধঃস্তন আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ জানাবে, আর তার বদলে ঐ সামন্তপ্রভুর কাছ থেকে অধঃস্তন পাবে ক্ষমতা, অধিকার আর ভূসম্পত্তি। এইভাবে রাজা থেকে নিম্নতম ভূস্বামীরা পরস্পর আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকত। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ প্রভু ও সর্বোচ্চ ভূস্বামী (Supreme Landlord)। তাঁর নিচে থাকত বড়, মাঝারি, ও ছোট ছোট সামন্তরা। উর্ধ্বতন হতেন **ওভারলর্ড** বা মহাসামন্ত (Overlord), আর অধঃস্তন হতেন **ভ্যাসাল** (Vassal)। **অধঃস্তনকে নতজানু হয়ে উর্ধ্বতনের কাছে বিশ্বাস ও আনুগত্যের শপথ** নিতে হত। একে বলা হত **ওথ অফ ফিয়ালটি** (Oath of fealty)। এই শপথ গ্রহণের বিনিময়ে প্রভু বা **লর্ড** (Lord) তাঁর ভ্যাসালকে দিতেন **ফিয়েফ** (fief) বা রাজ্যাংশ, অর্থাৎ ভূসম্পত্তি। এইভাবে দেশের ভূসম্পত্তি ও রাজার ক্ষমতা বিভিন্ন স্তরে ফিয়েফ অধিকারী অসংখ্য সামন্ত প্রভুরা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এইভাবে ব্যক্তিগত অধিকারে চলে যেত। এই অধিকার ভোগের বনিয়াদই ছিল জমি। জমির দান ও গ্রহণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। আর্থিক দিক থেকে ভূসম্পত্তি প্রধান ছিল বলে সমাজে ভূস্বামীরাই ছিলেন প্রধান। **ভূসম্পত্তি ও ভূস্বামী এই দুয়ের প্রাধান্যই হল সামন্ততন্ত্রের মূলকথা।** সমাজে জমিভিত্তিক যে সোপান বা ক্রমকাঠামো (Hierar-



সামন্ত প্রথায় শ্রেণী সোপান

chy) রচিত হয়েছিল তার সবচেয়ে নীচের সিঁড়িতে থাকত কৃষক। সামন্ততন্ত্র কৃষকদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। এই স্বাধীনতা-হীন কৃষকদের বলা হত সার্ফ (Serf)। সার্ফরা জমির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকত। জমির মত তারাও ছিল ভূস্বামী সামন্ত প্রভুদের সম্পত্তি। জমির হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তারাও হস্তান্তরিত হত। এইভাবে জমির উপর



ঘোড়ার পিঠে বর্ম পরিহিত নাইট

দাঁড়িয়েছিল সামন্ত প্রভু নামে মধ্যস্বত্ব* ভোগীদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। এই

* (মধ্যস্বত্ব-যারা কায়িক শ্রম করে না অথচ অন্যের শ্রমকে ভোগ অথবা আত্মসাৎ করে বেঁচে থাকে)।

অদ্ভুত ও নতুন ক্ষমতাতন্ত্র, শাসনতন্ত্র ও জীবনতন্ত্রকে একসাথে বলা হয় সামন্ততন্ত্র।

শিভ্যালরি ঃ সামন্ত প্রভুদের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধ করা। তাই ছোটবেলা থেকে তাদের আয়ত্ত করতে হত সাহস। শিখতে হত লড়াইয়ের কলা-কৌশল। **তিনটি পর্যায়ে** এই শিক্ষালাভ হত। বালক বয়সে সামন্ত প্রভুর সঙ্গে দুর্গে থেকে সে প্রতিদিনের পালনীয় নিয়মাবলী ও ভদ্র আচার-ব্যবহার শিখত। তখন তাকে বলা হত **পেজ** (Page)। আরও একটু বড় হলে তাকে অসিচালনা, অস্ত্র ছোঁড়া, শিকার, অশ্বারোহণ, আত্মরক্ষার কৌশল ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। তখন তাকে বলা হত **স্কোয়ার** (Squire)। শিক্ষা শেষ হলে সে শিক্ষাদাতা সামন্ত প্রভুর কাজে নতজানু হয়ে বসে তাকে তার প্রভু বলে মেনে নিত। সে প্রভুর কাছে বিশ্বাস, আনুগত্য ও নিয়ম মাফিক জীবনযাপনের শপথ গ্রহণ করত। তারপর প্রভু তার কাঁধে তরবারি স্পর্শ করে তাকে বীরধর্মে দীক্ষা দিতেন। তখন সে হত **নাইট** (Knight)। এই নাইটদের কিছু বীরত্বের আদর্শ পালন করতে হত। একে হলা হত **শিভ্যালরি** (Chivalry)। নারীর প্রতি ভদ্র ব্যবহার ও তার মর্যাদা রক্ষা, প্রভুভক্তি, প্রতিশ্রুতিরক্ষা, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন, অনাথ শিশুদের রক্ষা—এই সমস্ত পালনীয় আদর্শগুলি নাইটদের জীবনকে চালনা করত।

ট্রুবাদুর ঃ নাইটদের বীরত্ব, তাদের আত্মত্যাগ, নারীজাতির প্রতি সম্ভ্রম ইত্যাদি শিভ্যালরির নানাবিধ বিষয় নিয়ে একদল চারণ কবি গান রচনা করতেন। তাঁদের বলা হত ট্রুবাদুর (Troubadours)। তাঁদের আবির্ভাব **হয় দক্ষিণ ফ্রান্সে**। তাঁরা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে, এক রাজার সভা থেকে অন্য রাজার সভায় হাজির হয়ে শিভ্যালরির গান গাইতেন। আর তার মধ্য দিয়ে নারীর মর্যাদাকে তুলে ধরতেন। তাঁরা আঞ্চলিক ভাষায় গান লিখতেন বলে তাঁদের গানে আঞ্চলিক ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই রকম চারণকবিদের জার্মানিতে বলা হত **মিনেসিঙ্গার**। দ্বাদশ শতাব্দী ছিল এই সব চারণকবিদের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ।

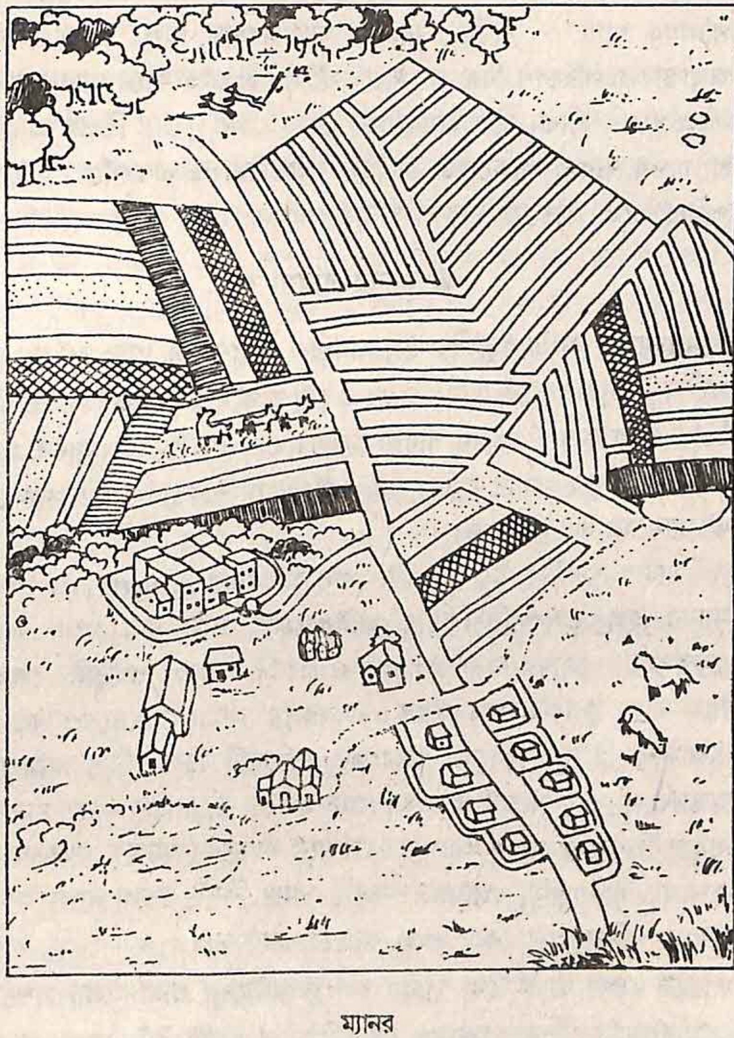
দুর্গ (ক্যাসল) ঃ সামন্ততন্ত্র ছিল যুদ্ধবিগ্রহের যুগ। এইজন্য সামন্ত প্রভুরা দুর্গে থাকতেন এবং সেখান থেকেই তাঁর রাজ্যশাসন করতেন। এই



দুর্গ

কারণে সামন্ততন্ত্রের সবচেয়ে বড় চিহ্ন হল দুর্গ। পাহাড়ের উপর বা কোন উচ্চ স্থানে দুর্গ তৈরী করা হত। সমতল ভূমিতে দুর্গ হলে তার চারপাশে পরিখা খনন করা হত। প্রথম দিকে দুর্গ তৈরী হত কাঠের। পরে পাথরের দুর্গ তৈরী হতে শুরু করে। পরিখা ঘেরা দুর্গের থাকত একটি বা দুটি সেতু। সেগুলিকে প্রয়োজন মত তুলে নেওয়া যেত। দুর্গের ভেতরে থাকত সৈন্যবাহিনী। তারা দুর্গের ভেতর থেকে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। অনেক সময়ে আক্রমণকারীরা দুর্গ অবরোধ করত। তখন বাইরে থেকে কোন খাদ্যশস্যের সরবরাহ করা যেত না। বাধ্য হয়েই দুর্গকে আত্মসমর্পণ করতে হত। দুর্গকে সরাসরিভাবে জয় করা ছিল কঠিন।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর চার্চের মঠগুলি যেমন দেশের শিক্ষা-আর সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছিল, সেইরকম বর্বরদের আক্রমণের যুগে দুর্গগুলি মানুষের জীবন ও সম্পত্তিকে রক্ষা করতে পেরেছিল। সামন্ত প্রভুরা দুর্গ ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনীর উপর নির্ভর করে চরম অরাজকতার দিনেও মানুষকে আশ্রয়দান করতে পেরেছিলেন। ভাইকিং (Vikings), স্যারাসেন (Saracens), মেগিয়ার (Magyars) প্রভৃতি



ম্যানর

দুর্ধর্ষ জাতিগুলির আক্রমণে মানুষ যখন অসহায় আর বিভ্রান্ত, রাজা যখন প্রজাদের রক্ষায় অক্ষম তখনই ঐসবের গুরুত্ব বোঝা যেতে লাগল। সে কারণে বলা হয়, ঘোড়ায় চড়া, বর্শাধারী, ভদ্র নাইট যেমন সামন্ত প্রথার একটি উন্নত প্রতীক, তেমনি দুর্গ ও অশ্বারোহী সৈন্য ছিল সামন্ত গৌরবের চিহ্ন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দুর্গের মধ্যে মানুষের জীবন ছিল সংকীর্ণ। ছোট

ছোট জানালা, দরজা ও অন্ধকার ঘরে বায়ু চলাচলের অভাব ছিল। অল্প পরিমাণ খাদ্য ও পানীয়, সামান্য আসবাবপত্র ছিল। ফলে সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করত। সর্বোপরি, এক স্থানে আবদ্ধ থাকার ফলে দুর্গের জীবন ছিল অসহনীয়। কোন কোন দুর্গের ভিতর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকলেও তা ছিল যৎসামান্য ও একঘেঁয়ে। এইরকম পরিস্থিতিতে জীবনের বিকাশ ঘটতে পারেনা, শেষ পর্যন্ত ঘটেওনি।

● ম্যানর ব্যবস্থা ●

সামন্ততন্ত্রের একটা বড় দিক হল সামরিক সাহায্যদান, আর দুর্গ হল তার প্রতীক। অনুরূপভাবে, সামন্ততন্ত্রের একটা অর্থনৈতিক দিক ছিল। জমিকে ভিত্তি করে তার উৎপাদন ব্যবস্থা চলত। তার প্রতীক হল ম্যানর হাউস বা সামন্ত প্রভুর খামার বাড়ি। সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রে থাকতেন ঐ ম্যানরের লর্ড বা প্রভু।

ম্যানর শব্দটির উদ্ভব ল্যাটিন শব্দ ম্যানিয়ার (manere) থেকে। ম্যানর হল ভূসম্পত্তি-বিস্তীর্ণ কৃষিকাজের জমি যার মধ্যে থাকত ক্ষেতখামার, চাষের জন্য জলাশয় ও গবাদি পশুর চারণভূমি। সেখানে সার্ফ নামে কৃষকরা চাষ করত। একসময়ে আমাদের দেশেও বড় বড় ভূস্বামীরা ছিলেন। তাঁদের অনেকের জমিদারি ছিল। কিন্তু জমিদারির অন্তর্গত সমস্ত কৃষি জমি ও জলাশয়ের মালিক তাঁরা ছিলেন না। ম্যানরের ব্যবস্থা ছিল এর থেকে আলাদা। সেখানে ম্যানরের মালিক খেত-খামার, জলাশয়, চারণভূমি, ছোটখাট বনভূমি-সমস্ত কিছুই ভোগ দখল করেন। এই সম্পত্তির অন্য কেউ দখল করতে পারত না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ম্যানর হল ভূস্বামীদের গ্রামাঞ্চলের সম্পত্তি। জার্মান জাতিগুলির আক্রমণে বেশ কিছুদিন ধরেই ইউরোপের ব্যবসা-বানিজ্য বন্ধ হয়ে আসছিল। শহরগুলিরও পতন ঘটছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলের কৃষিকাজই হয়ে উঠছিল মানুষের প্রধান জীবিকা। অভিজাতরাও তাদের গ্রামাঞ্চলের সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপরই নির্ভর করতে শুরু করেছিল। লর্ড, তাঁর পরিবার, তাঁর ভৃত্যকুল, তাঁর সৈন্যবাহিনী—সকলের জীবনধারণ চলত ম্যানরের আয় থেকে। এর ফল হয়েছিল এই যে,

ম্যানরের আয় বাড়ানোর প্রচণ্ড চেষ্টা চলত এবং শেষ পর্যন্ত কৃষকরা নির্মমভাবে শোষিত হত।

ম্যানরভুক্ত সামন্ত সমাজে শ্রেণী-বিন্যাস : ম্যানরে যারা বসবাস করত তারা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে ছিল কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমদান করে যারা বেঁচে থাকত তাঁরা—অর্থাৎ কৃষকরা। অন্য আরেকটি ভাগে ছিল সমাজের উপর তলার মানুষরা, যারা কৃষিকাজ করত না। তারা শুধুমাত্র সম্পত্তির মালিকানার জোরে অথবা সমাজে কৌলীন্যের জোরে অন্যের শ্রমের ফসলটুকু আত্মসাৎ করে বেঁচে থাকত। কৃষকদের দুটি ভাগ ছিল—মুক্ত কৃষক বা ভিলেন (Villein) এবং ভূমিদাস কৃষক বা সার্ফ (Serf)। উপরতলার মানুষদের দুটি ভাগ ছিল— অভিজাত শ্রেণী ও যাজক শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণী অর্থাৎ লর্ড ও তাঁর পরিবারের মানুষদের নিজস্ব কিছু জমি বা খাস জমি থাকত। তাকে বলা হত ডিমিন (demesne)। অবশিষ্ট জমি তিনি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এইভাবে লর্ডের কাছ থেকে জমি যারা পেত, ঐসব কৃষকদের বলা হত টেনেন্ট (Tenant) । যাজকরা ধর্মের বাণী প্রচার করতেন। কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। তাঁরা ধর্মপ্রচারের সময় একথাও বলতেন যে, ঈশ্বর তিনটি পৃথক শ্রেণী তৈরী করেছেন। যাজক ও অভিজাতদের শ্রদ্ধা করতে, তাঁদের হয়ে কাজ করতে তারা কৃষকদের শিক্ষা দিতেন। তখন প্রত্যেকটি দেশ অসংখ্য ম্যানরে বিভক্ত ছিল। শুধু ইংল্যন্ডেই ছিল নয় হাজার ম্যানর। আর এক একটি ম্যানরে ছিল কম করেও ছয়শত একর জমি। যাজকরা যদি কৃষকদের বশ করে না রাখতেন, তাহলে আবাদী জমি হয়ত আবাদি না হয়ে পড়ে থাকত। কৃষকরা হয়ত শোষণের বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়াত। যাজকরা কৃষকদের এই রুখে দাঁড়ানোর পথ বন্ধ করে দিতেন। কৃষকদের শোষনের ব্যাপারে এইভাবে যাজক-অভিজাত ঐক্য গড়ে উঠেছিল।

কৃষক ও সার্ফদের অবস্থা : সামন্ত যুগে কৃষকদের সুখ ছিল মাত্র একটাই। তাদের ছিল খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা ছোট কুঁড়ে ঘর, আর একখণ্ড জমি। এই ঘরে তারা অন্যের থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের পরিবার নিয়ে বাস করত। আর নিজেদের জমিতে মেহনত করে ফসল ফলাত। বছরে

দশমাস তাদের খাটতে হত। ফলে তাদের জীবন ছিল নিরানন্দময়। তাদের খাদ্য ছিল সাধারণ মোটা রুটি আর শাকসব্জী। তাদের নগদ অর্থের নিদারুণ অভাব ছিল। মুক্ত কৃষক ও সার্ফ উভয়কেই প্রভুর জমিতে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হত। প্রভুকে কর দিতে হলে, বা তার ঋণ শোধ করতে হলে তাদের প্রভুর জমিতে বেগার খাটতে হত। একে বলা হত **করভি (Corvee)**। সার্ফদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সকলকেই প্রভুর জমি, পশুপালন ও গার্হস্থ্য কাজে শ্রম দিতে হত এবং নানা রকমভাবে তার ফরমাস খাটতে হত। সব জুলুমকে সহ্য করেই কৃষকদের বেঁচে থাকতে হত। এই সময়ে যাজকদের মধ্যে ছিল রেষারেষি, আর সামন্ত প্রভুদের মধ্যে লড়াই লেগে থাকত। এর ফল ভোগ করত কৃষকরা। তাদের কখনো কখনো কৃষিকাজ ছেড়ে সৈন্যের কাজ করতে হত। আবার, কখনো বা খাদ্যশস্য ও হাঁস-মুরগী থেকে নগদ অর্থ পর্যন্ত অতিরিক্ত কর হিসাবে যাজক ও প্রভুদের দিতে হত। মুক্ত কৃষকরা অনেক সময়ে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জমি-জমা, বসতবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেত, কিন্তু সার্ফরা যেতে পারত না। প্রভুর সেবা করেই তাদের জীবন কাটত।

কৃষকদের আনন্দ বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। বছরে গ্রামে একবার দুবার মেলা বসত। সেটাই ছিল তাদের আনন্দ। ঈষ্টার, খ্রীষ্টমাস প্রভৃতি দিনগুলিতে তারা প্রভুর কাছ থেকে ছুটি পেত। তখন তারা খোলা মাঠে নাচগান করত। কিন্তু হঠাৎ সামন্ত প্রভুদের মধ্যে লড়াই বাঁধলে হত বিপদ। সৈন্য চলাচলের ফলে শষ্যের ক্ষতি হত। প্রভুর জুলুমও এই সময়ে বাড়ত। এমনিতেই কৃষকদের **টাইথ (Tithe)**, **সারভিসেস (Services)** ইত্যাদি বিভিন্ন কর প্রভুদের দিতে হত। তাছাড়া, কর-আদায়কারী কর্মচারীর অত্যাচার সহ্য করতে হত। তার উপর যুদ্ধের সময়ে সার্ফদের **করভি (Corvee)** বা বেগার খাটা ও জিনিসপত্রের মাধ্যমে কর দেওয়ার পরিমাণ বেড়ে যেত। কৃষকদের নিংড়ে নিয়ে তাদের শোষণ করা হত।

কৃষক-বিদ্রোহ ঃ দুঃখ-দুর্দশা আর নির্মম শোষণ থেকে মুক্তির উপায় ছিল বিদ্রোহ করা। সামন্ত যুগের শেষ দিকে সামন্ত প্রভুদের আয় কমতে

থাকে। তখন কৃষকদের উপর শোষণ বাড়তে থাকে। এই রকম শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কৃষকরা বিদ্রোহ করে। ফ্রান্সে, হল্যাণ্ডে ও ইংল্যান্ডে কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। ফ্রান্সের অভিজাতরা কৃষকদের বিদ্রুপ করে **জাকেস্ (Jalques)** বলে ডাকতেন। এর থেকেই এই বিদ্রোহের নাম হয় **জ্যাকেরি (Jacquerie)** । এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন **গিল্লমে ক্যালে (Guillaume Calle)**। তাঁকে হত্যা করা হয়। ১৩৮১ সালে ইংল্যান্ডের কৃষকরা **ওয়াট টাইলার (Wat Tyler)** নামে একজন নেতার অধীনে বিদ্রোহ করে। ইংল্যান্ডের রাজা একটি দুর্গে আত্মগোপন করলেন। কৃষকদের দাবি ছিল, কাউকে সার্ফ করে রাখা চলবে না, সবাইকে স্বাধীনতা দিতে হবে ও অত্যাচার মূলক সব কর তুলে দিতে হবে। আবার, বোহেমিয়াতে **ইয়ান হাসের (Yan Huss)** প্রেরণায় কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল।

কৃষক বিদ্রোহগুলি মূলত সামন্ত প্রভু, যাজক ও তাদের কর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। শোষিত মানুষের সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ সামন্তযুগের শেষ পর্বের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই বিদ্রোহগুলিকে দমন করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর ফলও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারও যেমন কমেছিল, সেইরকম কৃষক ও খেতমজুরদের মজুরিও কমে গিয়েছিল। ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি স্থানে এ ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এরপরে আর কেউ বলতে পারেনি যে, "জাকেদের পিঠ বড় চওড়া, তার উপর যা চাপাবে তাই তারা বহন করবে।" বেশ বোঝা গিয়েছিল যে, কৃষকরা আর অবহেলার পাত্র নয়। তাদের সঙ্ঘশক্তি সমাজের জগদ্দল পাথরকে নড়িয়ে দিতে পারে। যাবতীয় কৃষক বিদ্রোহ সমাজের শোষক ও শোষিত শ্রেণীর সম্পর্ককে নিশ্চিত পরিবর্তনের মুখে দাঁড় করিয়েছিল। এই পরিবর্তনের ইশারা নিয়ে সামন্তযুগ শেষ হয়।

● কী শিখলে ●

- সামন্ততন্ত্র প্রথা—হাজার বছর ধরে চলেছিল।
- উহা জমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা—পরস্পর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল, নানাধরণের সুবিধাভোগী শ্রেণীর ধাপ-সব নীচে ভূমিহীন

সার্ফ ও কৃষক-তারা চরম শোষিত ও অবহেলা অত্যাচারের শিকার। মানব সম্পদের অপব্যবহার ও উৎপাদন ব্যবস্থায় অসন্তোষ।

- কৃষক বিদ্রোহ—ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, হল্যাণ্ড, বোহেমিয়া ও নানা স্থানে —ইংল্যাণ্ডে সফল।
- নেতৃবৃন্দ—ওয়াট টাইলার, গিল্লমে, ইয়ান হাস প্রভৃতি। —ঐসব বিদ্রোহ সামন্তপ্রথার পতনের ইঙ্গিত দেয়। উহা সামন্ততন্ত্রের শেষ পর্বের সবচেয়ে বড় ঘটনা।
- সামন্তপ্রথার কিছু দিক—শিভ্যালরি, ম্যানর হাউস, দুর্গ, ট্রুবাদুর।
- সামন্তপ্রথা—রাজনৈতিক, বানিজ্যিক, বিদেশী আক্রমণ, দুর্বল রাজশক্তি, মানুষের নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতির মিলিত ফল।
- ঐ প্রথা সাধারণ মানুষকে শোষণ করেছিল। আবার সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে বাঁচিয়েছিল।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) ইউরোপের সামন্ততন্ত্র ব্যবস্থার শুরু হয়েছে—১ম শতাব্দী থেকে/পঞ্চম শতাব্দী থেকে/নবম শতাব্দী থেকে/একাদশ শতাব্দী থেকে।

(খ) সামন্ততন্ত্রের অন্যতম শর্ত ছিল—১) নিম্নস্তরের ভূস্বামীদের উপর স্তরের ভূস্বামীদের নিকট আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ।

২) উঁচুস্তরের ভূস্বামীদের বাড়িতে নীচুস্তরের ভূস্বামীদের বেগার খাটতে হোত।

৩) মহাসামন্তদের ব্যবসা করে কর দিতে হোত।

৪) ভূস্বামীদের দেশ আবিষ্কারে যেতে হোত।

(গ) সামন্ততন্ত্রের সব চেয়ে নীচের সারিতে ছিল—লর্ড/ব্যারন/কৃষক/নাইট।

(ঘ) ট্রুবাদুর বলতে বোঝান হয়—নাইটদের বীরত্ব নিয়ে আঞ্চলিকভাষার গায়কদের গান/রাজাদের বীরত্ব নিয়ে রাজভাষার গায়কদের গান /লর্ডদের বিলাসিতা নিয়ে রাজভাষার গায়কদের গান/বর্বরদের আক্রমণ নিয়ে গায়কদের গান।

(ঙ) ম্যানর কথাটির অর্থ হোল— ভূসম্পত্তির মালিক/শিল্পমালিক/নাইট/ভিলেন।

(চ) কৃষককে ভূস্বামীদেরকে দিতে হত এমন একটি করের নাম—/করভি/ফিউড/টেনেন্ট।

(ছ) ইংল্যান্ডের কৃষক বিদ্রোহের মূল দাবি ছিল—১) সবাইকে জমি দিতে হবে।
২) সবাইকে ভালো জায়গায় থাকতে দিতে হবে।
৩) সবাইকে স্বাধীনতা দিতে হবে।
৪) সবাইকে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) সামন্ততন্ত্র কোন ল্যাটিন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে ?
(খ) কতদিন ধরে সামন্তপ্রথা ইউরোপে চালু ছিল ?
(গ) কোন ঘটনার পর এই প্রথা লোপ পায়?
(ঘ) এ ব্যবস্থায় রাজার ক্ষমতা কেমন ছিল ?
(ঙ) ফিয়েফ বলতে কী বোঝায়?
(চ) 'ভ্যাসাল' কাদের বলা হোত ?
(ছ) সার্ফরা কিভাবে হস্তান্তরিত হোত ?
(জ) মিনেসিঙ্গার কাদের বলা হয় ?
(ঝ) প্রত্যেক ম্যানরে কমপক্ষে কী পরিমাণ জমি থাকত ?
(ঞ) দুঃখ-দুর্দশা থেকে সার্ফদের বাঁচার শেষ পথ কী ছিল ?
(ট) ফ্রান্সে বিদ্রোহী কৃষকদের কী নামে ব্যঙ্গ করা হোত ?
(ঠ) ইংল্যান্ডে কত সালে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল ?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) সামন্ততন্ত্রের রাজার ক্ষমতা কিভাবে নষ্ট হয় ?
(খ) সামন্ততন্ত্রের নানান স্তরের নামগুলি কী কী ?
(গ) সার্ফ কাদের বলা হোত ?
(ঘ) 'শিভ্যালরি' আদর্শের মূল দিকগুলি কী ছিল ?
(ঙ) ট্রুবাদুরদের প্রধান কাজ কী ?
(চ) সামন্তযুগে দুর্গ তৈরী করতে হোত কেন ?
(ছ) জমিদারি ও ম্যানরের মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায় ?
(জ) কৃষকদের কী ধরনের শোষণমূলক কর দিতে হোত ?
(ঝ) কৃষকরা কেন ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ?

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের কীভাবে সূচনা হয় ?
(খ) সামন্ততন্ত্রের মূল আদর্শ কী কী ? একে সুষ্ঠু জীবনপদ্ধতি বলা যায় না কেন?
(গ) ঐ ব্যবস্থায় কৃষক ও সার্ফদের জীবনধারা বর্ণনা কর অথবা তাদের জীবনের

তুলনা কর।

(ঘ) শিভ্যালরিদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হোত ?

(ঙ) শিভ্যালরি নাইটদের আবদান ব্যাখ্যা কর ?

(চ) মধ্যযুগে 'দুর্গের' উৎপত্তির কী কী ফল হয়েছিল ?

(ছ) দুর্গের অভ্যন্তরের জীবনযাত্রার পরিচয় দাও ?

(জ) 'ম্যানরের' জীবনযাত্রায় সাধারণ মানুষদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধার চারটি দিকের ব্যাখ্যা কর।

(ঝ) সামন্ততন্ত্রে কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল কেন ? উহার ফলাফল কি হয়েছিল?

৫। ভুল সংশোধন করে লেখ ঃ

(ক) সামন্ততন্ত্র বর্বর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে।

(খ) ঐ প্রথায় মূলভিত্তি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য।

(গ) কৃষকরা সার্ফদের তুলনায় আরও খারাপ অধিকার ভোগ করত।

(ঘ) বর্বর জাতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভ্যাসা ল ও ভিলেন।

(ঙ) যাজকরা কৃষকদের শোষণের প্রতিবাদ করেছিল।

৬। টীকা লিখ :

ট্রুবাদুর, নাইট, শিভ্যালরি, সামন্ততন্ত্রের শ্রেণী সোপান, ওয়াট টাইলার, ইয়ান হাস।

।। সপ্তম অধ্যায় ।।

● ক্রুসেড ●

সূচনা ঃ প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত জেরুজালেম যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান। জেরুজালেম যীশুর কর্মস্থান ও সমাধিভূমি রূপেও প্রসিদ্ধ। তাই, খ্রীষ্টানরা দলে দলে তীর্থ করতে জেরুজালেমে সমবেত হতো। সপ্তম শতকে জেরুজালেম আরবদের দখলে চলে যায়। কিন্তু খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের জেরুজালেম তীর্থ করতে কোন অসুবিধা হয়নি। একাদশ শতকে সেলজুক তুর্কীরা জেরুজালেম দখল করে। এই সময় থেকে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপরে তুর্কীদের অত্যাচারের নানা ঘটনা রোমের পোপ ও পাদরিদের মুখে শোনা যায়। তুর্কী কবল থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করা খ্রীষ্টানদের 'পবিত্র কর্তব্য' বলে তাঁরা ঘোষণা করেন। রোমের পোপ ও সামন্ত রাজারা পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টানদের তুর্কী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেন। একাদশ শতক (১০৯৬ খ্রীঃ) থেকে ত্রয়োদশ শতক (১৩৯১ খ্রীঃ) পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর ধরে জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে খ্রীষ্টান ও তুর্কী মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ 'ক্রুসেড' নামে খ্যাত। দীর্ঘ দু'শ বছরে প্রায় আটটি ক্রুসেড হয়। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেড এই সব ক্রুসেডের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম ক্রুসেড (১০৯৫-১০৯৯ খ্রীঃ) ঃ ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডের সূচনা হলেও সামরিক অভিযান আরম্ভ হয় ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। পোপ দ্বিতীয় আর্বান ও পিটার দ্য হারমিট নামে এক পাদরির প্রচারে উৎসাহিত হয়েই ফরাসী নাইট ও ব্যারনরা এই যুদ্ধে যোগ দেয়। সৈনিক হিসাবে যোগ দেয় হাজার হাজার ভূমিদাস ও সাধারণ মানুষ। ফলে ঐ অঞ্চলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তুর্কীদের হাতে এরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। প্রায় এক লক্ষ ধর্মযোদ্ধা নিহত হয়। পিটার পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। ইউরোপের সামন্ত রাজারা চার হাজার নাইট বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ চালান। শেষ পর্যন্ত ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নাইট বাহিনী জেরুজালেম দখল করে।

মুসলমানরা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় **দ্বিতীয় ক্রুসেডে (১১৪৬-১১৪৮ খ্রীঃ)** খ্রীষ্টানরা পরাজয় বরণ করে।

তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯-১১৯২ খ্রীঃ) ঃ ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের সুলতান

সালাদিন খ্রীষ্টানদের বিতাড়িত করে জেরুজালেম অধিকার করেন। ফলে পোপ অষ্টম গ্রেগরী ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন। ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড, জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা প্রমুখ রাজারা এই যুদ্ধে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি 'রিচার্ড দ্য লায়ন হার্ট' আখ্যা লাভ করেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে সালাদিনের সঙ্গে সন্ধি করে তিনি দেশে ফিরে যান। ঠিক হয় যে, খ্রীষ্টানরা জেরুজালেমে তীর্থ করতে পারবে। খ্রীষ্টানদের আর জেরুজালেম জয় করা হল না।

চতুর্থ ক্রুসেড (১২০২-১২০৪ খ্রীঃ) ঃ এই যুদ্ধের ডাক দেন পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট। ইউরোপের রাজাদের মধ্যে ক্রুসেডে যোগ দেবার বা জেরুজালেম উদ্ধার করার করার আগ্রহ আর তেমন ছিল না। কিন্তু পূর্বদেশে ব্যবসায়ে উন্নতি করার জন্য ভেনিসের বণিকদের এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল। ভেনিসের বণিকদের অর্থ সাহায্য নিয়ে ফরাসী ও ইটালীর সামন্তপ্রভুরা ক্রুসেডে যোগ দেয়। তারা কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করে এবং সেখানকার নাগরিকদের ও গির্জার সম্পত্তি লুঠ করে। কিন্তু প্যালেস্টাইনে মুসলিম কর্তৃত্ব থেকেই যায়।

ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ঃ পূর্ব রোমান সম্রাট আলেকসিয়াস সেলজুক তুর্কীদের আক্রমণ থেকে তাঁর সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য পোপের শরণাপন্ন হন। অন্যদিকে, পূর্ব ইউরোপের গ্রীক চার্চ ও পশ্চিম ইউরোপের ল্যাটিন চার্চের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় পোপের ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস পায়। তাই, একদিকে পূর্ব ইউরোপের সাম্রাজ্য রক্ষা এবং অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপে পোপের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারই ছিল ক্রুসেডের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

দশম শতকের মধ্যে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ইটালীর বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি ঘটানোর জন্য ভূমধ্যসাগরে কর্তৃত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হয়। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটাতে ধর্মের দোহাই দিয়ে ক্রুসেডের অর্থ যোগান দেয়। ম্যানর থেকে সামন্তপ্রভুদের আয় কমে যাচ্ছিল। বিলাসবহুল জীবনযাত্রা বজায় রাখতে তারা পূর্ব ইউরোপের নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলতে ক্রুসেডে যোগ

দেয়। সামন্তপ্রভুদের শোষণ ও করের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে লক্ষ লক্ষ গরীব চাষী মজুর ক্রুসেডে যোগ দেয়। পোপ সামন্ত রাজাদের ক্রুসেডে যোগদানে উৎসাহ দেন। উদ্দেশ্য ছিল, রাজার ক্ষমতার চেয়ে পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ক্রুসেডের প্রভাব ঃ খ্রীষ্টানরা জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতায় ক্রুসেডের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম ইউরোপে শহর সভ্যতার দ্রুত বিস্তার ঘটে। কারিগরী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। পোপের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে হাজার হাজার চাষী ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিল। ক্রুসেড থেকে ফিরে তারা স্বাধীন কারিগরের জীবন বেছে নেয়। বণিক মহাজনদের উৎসাহে পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের আর্থিক ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সমাজে মহিলাদের প্রাধান্য দেখা দেয়। পুরুষরা দীর্ঘদিন বিদেশে থাকায় ঘরে বাইরে মহিলাদেরই সব দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারা সামাজিক দায়িত্ব পালনে দক্ষ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, ইউরোপের সাথে এশিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় ঘটে। ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। আরবদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায় ইউরোপ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচিত হতে পারে। এইভাবে ইউরোপে নবজাগরণের পটভূমি তৈরি হয়।

● কী শিখলে ●

- ক্রুসেড প্রায় দু'শ বছর ধরে চলেছিল।
- জেরুজালেম অধিকার নিয়ে মূলত লড়াই, তবে পোপ, ব্যবসায়ী, সামন্ত প্রভু, সম্রাট ও রাজারা নানান উদ্দেশ্য নিয়ে ক্রুসেডে যোগদান করেছিল।
- ধর্ম নিয়ে অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি ও হানাহানি ঘটে যা শুভকর নয়।
- ক্রুসেডের ফলাফল—সূদুর প্রসারী-সামন্তপ্রথার পতন, সার্ফ ও গরীব কৃষকদের মুক্তি, বানিজ্যের প্রসার, শহরের বৃদ্ধি, নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি, পূর্ব ও পশ্চিমের মানুষের ও সভ্যতার মিলন।

অনুশীলনী

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন—জেরুজালেমে/রোমে/ইংল্যান্ডে/ফ্রান্সে।

(খ) ক্রুসেড স্থায়ী হয়েছিল—প্রায় পনের'শ বছর/প্রায় দু'শ বছর/প্রায় পাঁচ'শ বছর/প্রায় এক'শ বছর।

(গ) ক্রুসেডের জন্য প্রথম ধ্বনি তোলেন—শার্ল্যামেন/পোপ দ্বিতীয় আর্বান/চার্লস মর্টেল/ইয়ান হাস।

(ঘ) ক্রুসেডের অন্যতম কারণ হোল—পোপের হৃত মর্যাদার পুনরুদ্ধার/বণিকদের ক্ষমতালাভ/তুর্কীদের জেরুজালেম দখল/কৃষকদের উপর অত্যাচার।

(ঙ) ক্রুসেডের শুরু হয়—৭১২ সালে/৮০০ সালে/১০৯৬ সালে/১১৯২ সালে।

(চ) 'হারমিট' উপাধিধারী ছিলেন—পোপ লিও/পোপ গ্রেগরী/পোপ দ্বিতীয় আর্বান/মহামতি পিটার।

(ছ) সালাদিনের সঙ্গে রিচার্ডের চুক্তির ফলাফল হোল—

ক) খ্রীষ্টানগণ রোমে ধর্মচর্চা করবে।

খ) খ্রীষ্টানগণ সমস্ত কৃষক ও সার্ফদের মুক্তি দেবে।

গ) খ্রীষ্টানগণ সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে দেবে।

ঘ) খ্রীষ্টানগণ জেরুজালেমে তীর্থ করতে পারবে।

(জ) বাণিজ্য শহরগুলির অন্যতম ছিল—ইংল্যান্ড/জার্মানী/ভেনিস/ইতালী।

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) সেলজুক তুর্কীরা কোন শহর দখল করেছিল ?

(খ) জার্মানীর সম্রাট কে ছিলেন ?

(গ) সালাদিন কে ছিলেন ?

(ঘ) কোন বাহিনী জেরুজালেম জয় করেছিল ?

(চ) রিচার্ড কোন ক্রুসেডের নেতৃত্ব দেন ?

(ছ) চতুর্থ ক্রুসেডে বণিকরা কনস্ট্যান্টিনোপলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কেন?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) বণিকগোষ্ঠীর বাজারের চাহিদা ক্রুসেড কিভাবে এগিয়ে দেয় ?

(ঘ) সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেরা কিভাবে ঐ ঘটনায় উৎসাহিত হয় ?

(ঙ) তৃতীয় ক্রুসেডের উল্লেখযোগ্য দিক আলোচনা কর।

(চ) চতুর্থ ক্রুসেডে কারা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন ?

(ছ) পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্যের প্রভাব কী রকম পড়েছিল ?

(জ) পোপের ক্ষমতা কিভাবে ক্রুসেডের ফলে বেড়ে যায় ?

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রুসেডের বিবরণ ও ফলাফল লিখ।

(খ) ক্রুসেড সংঘটিত হবার মূলে ধর্ম না সামাজিক কারণ প্রবল ছিল—আলোচনা কর।

(গ) সামন্ততন্ত্রের শোষণের ফলে ক্রুসেড আরও জোরদার হয়—৩টি যুক্তি দাও।

(ঘ) ক্রুসেড সারা ইউরোপে রাজনৈতিক ঐক্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

(ঙ) ইউরোপের অর্থনীতি ও বাণিজ্য কীভাবে উপকৃত হয় ?

(চ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কী ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও লেনদেনের সুযোগ ঘটে ?

৫। সময়ক্রম অনুসারে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিকে সাজাও ঃ
রিচার্ড-সালাদিনের সন্ধি, সেলজুকদের জেরুজালেম অধিকার, চতুর্থ ক্রুসেড, নাইটদের জেরুজালেম অধিকার, রাজা ফিলিপ।

৬। টীকা লিখ :
জেরুজালেম, সালাদিন।

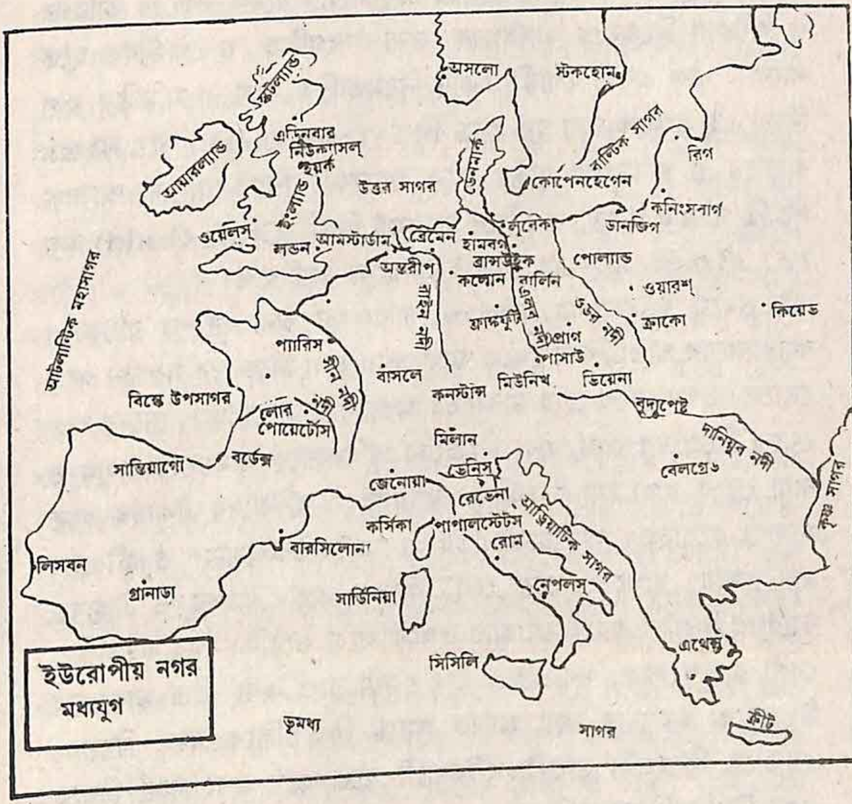
।। অষ্টম অধ্যায় ।।

● মধ্যযুগে নগরের উদ্ভব ●

সূচনা ঃ জার্মান জাতির আগমনে ইউরোপে পুরানো নগরজীবনের অবসান ঘটেছিল। ভিসিগথ, অষ্ট্রোগথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি জাতির আক্রমণে বহু শহর ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছিল। দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে রাজনৈতিক শান্তি ফিরে এল। বাণিজ্যের প্রসার হল ও বণিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল। তাছাড়াও, যখন কৃষি থেকে কুটির শিল্প বিচ্ছিন্ন হল, তখনই আবার, একটু একটু করে শহর গড়ে উঠতে লাগল। জীর্ণ হয়ে যাওয়া পুরাতন নগরগুলি আবার জেগে উঠল, নতুন নগরের পত্তন হল। ইউরোপ জুড়ে এক নগর বিপ্লব দেখা দিল। ইটালী, জার্মানী, ইংল্যান্ড ও রাশিয়ায় গড়ে উঠল অনেক নতুন নতুন নগর।

নগর বিকাশের ধারা ঃ ইউরোপে নগর বিকাশের ধারায় দুটি ঘটনার প্রভাব সবথেকে বেশী কাজ করে—একটি হল জনসংখ্যার বৃদ্ধি, অন্যটি হল ক্রুসেড। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল গ্রামে ও শহরে সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। ঘন বসতি, কর্মের নতুন বিন্যাস, কৃষির সঙ্গে যোগ না থাকা মানুষের চাহিদা, প্রভৃতির চাপে গ্রামের চিরাচরিত জীবন পদ্ধতি পাল্টাচ্ছিল। গ্রাম রূপান্তরিত হচ্ছিল নগরে। গ্রামের মানুষ কাজের সন্ধানে ক্রমাগত শহরে আসছিল। সেখানে শ্রমের যোগান বাড়ায় কুটির শিল্পও বাড়তে থাকে। শিল্পকে ঘিরে মানুষের বসতি বাড়ে। এর ফলে ছোট ছোট শহর আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। কোথাও বা মঠের চারদিকে মানুষের বসতি বাড়ে।

জনসংখ্যার চাপ ছাড়াও ক্রুসেড নগরের উৎপত্তিতে সাহায্য করেছিল। ক্রুসেডের ফলে বাণিজ্য বেড়েছিল। আর সব কিছুর সঙ্গে তাল রেখে শক্তিশালী এক বণিকশ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল। শহর, বন্দর, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদির উন্নতির জন্য বণিকরা অর্থ বিনিয়োগ করত। ক্রুসেডের ফলে সামন্ত শ্রেণীর মানুষেরা দূর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে বন্দর ও নগরগুলির কর্তৃত্ব বণিক সমবায়ের হাতে চলে যায়। এইভাবে তাদের আর্থিক ক্ষমতা ও পুঁজি বৃদ্ধি পায়। পরে তারাই যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে শুরু করল, তখন তাদের মধ্যে নিজেদের জীবনযাত্রার মান



ইউরোপীয় নগর
মধ্যযুগ

উন্নতির ইচ্ছা দেখা দিল। এর সঙ্গে তাল রেখে বদলে গেল তাদের জীবন বোধ ও জীবন পদ্ধতি। নতুন জিনিসের চাহিদা থেকে গড়ে উঠল নতুন শিল্প, কারিগরী ব্যবস্থা। গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা কৃষক ও মুক্ত সার্ফরা শহরে এসে কারিগরী পেশা গ্রহণ করল। এই সকল কারণে শহরের উদ্ভব ছিল খুব স্বাভাবিক ও অপরিহার্য।

গিল্ড ব্যবস্থা ঃ নগরগুলির উদ্ভবের কিছুকালের মধ্যেই নগরের কারিগর ও বণিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগঠিত ও গোষ্ঠীবদ্ধ হতে থাকে। এক একটি গোষ্ঠী একটি নিয়মতান্ত্রিক সংঘ বা সমিতির রূপ নিত। এই সংঘকে বলা হত **ট্রেড গিল্ড** (Trade Guild)। পরে শহরের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রত্যেকটি শিল্পে আলাদা আলাদা সমিতি গঠন করা হয়। এগুলিকে **'ক্র্যাফট গিল্ড'** (Craft Guild) বলা হত। এইগুলিই এখনকার ট্রেড ইউনিয়নের আদিরূপ।

এই সময়ে ইউরোপের বণিক ও কারিগররা অন্য দেশের বণিক ও কারিগরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলে। তখন দেশে চোর ডাকাতের অত্যাচারও বেড়েছিল। তাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা, এবং নিজেদের অধিকারকে সামন্তদের জুলুম ও বাধা থেকে রক্ষা করার তাগিদও কারিগর ও বণিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও জীবনের মান বজায় রাখতে তারা জোট বাঁধে। এত ব্যাপক ও ঐক্যবদ্ধ কারিগর সংগঠন এর আগে আর কখনো গড়ে ওঠেনি। নগর কর্তৃপক্ষরা বেশী রাজস্ব লাভ, পণ্যদ্রব্যের মান বজায় রাখা এবং চোর ডাকাতের উপদ্রবকে কমানোর জন্য অনেক সময়ে গিল্ডগুলিকে মদত দিতেন। এইভাবে গিল্ডগুলি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নানা বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার দাবি করে।

গিল্ডের কার্যাবলী ঃ গিল্ডের দুটি মূল কাজ ছিল—বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অভ্যন্তরীণ অত্যাচার থেকে কারিগরদের রক্ষা করা। আর অসৎ কারিগরদের হাত থেকে ক্রেতাদের মুক্ত রাখা ও পণ্যদ্রব্যের মান ঠিক রাখা। প্রত্যেক গিল্ডে তিন ধরনের সদস্য থাকত। এই সদস্যদের সংখ্যা নির্ভর করত গিল্ডের অধীনে কটা ছোট-বড় কারখানা ছিল এবং সেই

কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও কারিগরের সংখ্যা কত ছিল তার উপর। এই তিন ধরনের সদস্য হল কারখানার মালিক বা **মাস্টার**, শিক্ষানবিশ বা **এ্যাপ্রেন্টিস (Apprentice)** এবং বেতনভুক্ত কর্মচারী বা **জার্নিম্যান (Journeyman)**। গিল্ড এদের সকলকে পরিচালনা করত। গিল্ডভুক্ত কেউ এককভাবে নিজের প্রচার চালাতে পারত না বা সিদ্ধান্ত নিতে পারত না। গিল্ডও অনেক সময় নিজস্ব ইচ্ছায় কিছু করতে পারত না, কারণ গিল্ডের উপর **টাউন কাউনসিল (Town Council)** বা নগর সভার শাসন কর্তৃত্ব ছিল।

নগরজীবন ঃ মধ্যযুগের নগরগুলি ছিল আয়তনে ছোট। কিন্তু জনসংখ্যা আয়তনের তুলনায় ছিল বেশী। নগরগুলি সচরাচর বাড়তে পারত না, কারণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও বাইরের লুঠতরাজ থেকে রক্ষার জন্য চারদিকে প্রাচীর বা পরিখা দিয়ে ঘিরে রাখা হত। ঘনবসতি, সঙ্কীর্ণ বাসস্থান আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ—এর থেকে জন্ম নিত প্লেগ ইত্যাদির মত কঠিন ব্যাধি। সেযুগে মহামারী ছিল শহরের সাধারণ ঘটনা। রাত্রে চোর-ডাকাতের উপদ্রব কম ছিল না।

শহরের মাঝখানে ছিল **টাউন হল** বা সভাগৃহ, **থিয়েট্রাম** বা নাট্যশালা ইত্যাদি। সভাগৃহে প্রশাসনের কাজ চলত, আর নাট্যশালায় চলত আমোদ-প্রমোদ, ভোজন ইত্যাদি। শহরের সাধারণ মানুষের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। সাধারণ কারিগররা সপ্তাহের শেষে বেতন পেত। তাদের জীবিকার কোন স্থিরতা ছিল না। জার্নিম্যানরা অনেক সময়ে ভিক্ষা করে জীবিকা অর্জন করত। শহরের ভেতর একটি বা দুটি গির্জা থাকত। আর সেখানেই উপাসনা থেকে বিবাহ পর্যন্ত সব কাজই সম্পন্ন হত। শহরের প্রশাসন· চালাত **টাউন কাউন্সিল**। শহরের গির্জা ও টাউন হলই ছিল সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি।

খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির জন্য মধ্যযুগের শহরগুলিকে গ্রামের উপর নির্ভর করতে হত। গরীবদের আহার ছিল সাধারণ। তাদের পোশাক ছিল সাদামাটা। আর তাদের বাড়িঘর ছিল কাঠ দিয়ে তৈরী, অপোক্ত। শহরে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড হত, আর তাতে গরীবরাই হত ক্ষতিগ্রস্ত। ঘনবসতি, ঘেঁষাঘেঁষি জীবন, গরীব মানুষের আধিক্য, জীবনযাপনে একঘেঁয়েমি—

এসবই হল মধ্যযুগীয় শহরজীবনের বৈশিষ্ট্য।

নগরের স্বায়ত্তশাসন লাভ ঃ মধ্যযুগের শহরগুলি কোন না কোন সামন্ত প্রভুর এলাকায় গড়ে উঠেছিল। ফলে সামন্ত প্রভুরা শহরের উপর জুলুম করত। শহরের অধিবাসীদের কাজ থেকে তারা কর আদায় করত। বণিকদের উৎপীড়ন করে অর্থ আদায় করত এবং নিজেদের সেনাবাহিনী দিয়ে শহরের ভেতর লুঠপাট চালাত। এতে শহরের শিল্প-বাণিজ্য-নিরাপত্তা এবং শহরের অস্তিত্ব বিপন্ন হত।

স্বায়ত্তশাসন লাভ ঃ এদিকে নগরগুলির মধ্যে দেখা দিচ্ছিল একটা স্বাধীন মনোভাব এবং সামন্তদের জুলুম ঠেকানোর সঙ্কল্প। বাণিজ্যের উন্নতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাচীর ঘেরা নগরের মধ্যে বণিক ও কারিগরদের আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতাবোধও বাড়ছিল। তাছাড়া, বাইরে থেকে সামন্তদের জুলুম ঠেকানোর মত যথেষ্ট অর্থ, জনবল ও ঐক্যবোধও নগরগুলি আয়ত্ত করেছিল। ফলে দেখা দিল সামন্ত প্রভু ও রাজ শাসনের বিরুদ্ধে নগরগুলির অনবরত লড়াই। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে জোট বেঁধে, নগরে নগরে সন্ধি করে, বিদ্রোহ করে, লড়াই করে নগরবাসীরা নিজেদের অধিকার আদায় করে। আবার কখনো বা আপস করে, কখনো বা যুদ্ধ করে নগরগুলি নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের সনদ আদায় করেছিল। এইভাবে ঐক্যবদ্ধ নগরগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছিল **লীগ অফ ভেরোনা, লাম্বার্ড লীগ, হান্সিয়াটিক লীগ** ইত্যাদি। এই সমস্ত লীগগুলির অধীনে বিভিন্ন নগর প্রায় স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। নগরবাসীরা নগর পরিচালনা করত। নগরের শাসন কার্যের জন্য তারা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন মেয়র ও কয়েকজন অল্ডারম্যান নির্বাচিত করত। এদের হাতে শহরের শাসন ও প্রয়োজনীয় আইন রচনার অধিকার ছিল। এতে শহর জীবন অনেক উন্নত হয়েছিল।

● কী শিখলে ●

- মধ্যযুগে নগর বিপ্লব একটি উল্লেখযোগ্য দিক—রাজনৈতিক শান্তি, ক্রুসেড, জনসংখ্যার চাপ, বানিজ্য ও কৃষির উন্নতি এই বিপ্লব ঘটায়।
- নগরের ঘেরা পরিবেশে কারিগররা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সমিতি বা গিল্ড গড়ে তোলে। ঐ সব গিল্ড রাজা/সামন্ত প্রভুদের

কাছ থেকে বিদ্রোহ করে ও স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করে। নিজেরা শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

- শহরগুলি ছিল যেমন বিলাসের জায়গা, তেমনই সেখানে ছিল নানা কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

প্রশ্নাবলী

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) শহরের প্রতি আকর্ষণের ফল হিসাবে দেখা দিল—

ক) পুরুষদের মধ্যে জমি সংরক্ষণের মনোভাব।

খ) মেয়েদের দিয়ে জমি সংরক্ষণের মনোভাব।

গ) পাদরীদের দিয়ে ব্যবসা করানোর মনোভাব।

ঘ) কুটির শিল্পে উন্নতি।

(খ) ঐ যুগের ঐক্যবদ্ধ আর্থিক সঙ্ঘকে বলা হোত—গিল্ড/ফিউড/টেনেন্ট/ম্যানর।

(গ) গিল্ডের সদস্যারা দুভাগে/তিনভাগে/চারভাগে/পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল।

(ঘ) মধ্য যুগের শহরগুলি ছিল—চারিদিকে খোলা/তিন দিকে ঘেরা/পরিখা দ্বারা ঘেরা/চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত।

(ঙ) নগরের শাসন চালাত—থিয়েট্রাম/ক্যাথিড্রাল/টাউন কাউন্সিল/সার্ফ।

২। টীকা লিখ—গিল্ড, নগর বিপ্লব, টাউন কাউন্সিল।

৩। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর অথবা শুদ্ধ করে লেখ ঃ

(ক) ট্রেড গিল্ড ছিল এখনকার শ্রমিক ইউনিয়নের মত।

(খ) নগরের শাসনকর্তাকে মেয়র বলা হোত।

(গ) ক্রুসেডের ফলে শহরের উৎপত্তি বাধা পায়।

(ঘ) লীগ অফ ভেরোনা শহরগুলিকে শুধু আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছিল।

(ঙ) সাধারণ মানুষের নগর জীবন ছিল আনন্দে ভরপুর।

(চ) ঐ যুগের শহরগুলি ছিল আমাদের বড় বড় শহরের সমান।

৪। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) কোন সময় থেকে ইউরোপে শহরের উৎপত্তি ঘটে?

(খ) শহরের উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রে কাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়?

(গ) শহরগুলির মধ্যে একতা গড়ে ওঠার একটি কারণ লিখ।

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) মধ্যযুগে নগর বিপ্লব কীভাবে দেখা দিয়েছিল? দুটি কারণ লিখ।

(খ) শহরের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হবার কারণ কি?

(গ) সামন্ত প্রভুরা নগরের উপর আক্রমণ করত কেন?

৬। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) মধ্যযুগে নগর বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বর্ণনা কর।

(খ) গিল্ড গড়ে ওঠার পেছনে কি কি কারণ ছিল?

(গ) জীবন ও জীবিকায় গিল্ডের ভূমিকা বর্ণনা কর।

(ঘ) গিল্ডের কার্যাবলীর পরিচয় দাও।

(ঙ) নগর জীবনের দুঃখদর্দশার দিকগুলি ফুটিয়ে তোল।

(চ) নগরগুলির মধ্যে কিভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে উঠেছিল?

(ছ) নগরগুলি কিভাবে স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছিল?

।। নবম অধ্যায় ।।

• মধ্যযুগে সুদূর প্রাচ্য •

• মধ্যযুগের চীন : সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী •

সূচনা : ভারতবর্ষ, মিশর, মেসোপটেমিয়ার মত পৃথিবীর প্রাচীনতম ও সর্বোৎকৃষ্ট সভ্যতাগুলির একটি হল চীনের সভ্যতা। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে চীনের ঐক্য ভাঙতে থাকে। এই ঐক্য ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে চীনে মধ্যযুগের সূচনা হয়।

তাং যুগ (৬১৮-৯০৭ খ্রীঃ) : চীনা ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : তৃতীয় শতাব্দীতে চীন সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আঞ্চলিক শাসনকর্তারা স্বাধীন হয়ে উঠতে থাকে। মোঙ্গল, হূণ, তুর্কী, তাতার প্রভৃতি জাতিগুলি চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। একের পর এক ক্ষণস্থায়ী রাজবংশ ক্ষমতায় আসে। দেশের ঐক্যকে ধারণ করার মত বড় সাম্রাজ্য এরা কেউই গড়ে তুলতে পারেনি।

৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুই বংশেরই ক্ষমতাসম্পন্ন পদস্থ কর্মচারী **লি ইউয়ান** (Li Yuan) সিংহাসন দখল করেন। ইতিহাসে তিনিই সম্রাট **কাও সু** (Kao Tsu) নামে পরিচিত। তাঁর বংশই হল তাং রাজবংশ (Tang Dynasty)। প্রায় তিনশ' বছর তাঁর রাজবংশ চীনে রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজধানী ছিল **চাঙ্গান** (Changan)। রাজা কাও সু তাঁর পুত্র **তাং তাই সুং** চীন সাম্রাজ্যের ঐক্য সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালেই চীনে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সুং ছিলেন তাং বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। দক্ষ, রণনিপুণ ও কর্তব্যপরায়ণ সম্রাট হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। পরে **সুয়াং সুং**-এর রাজত্বকালে চীনের সাম্রাজ্য সবচেয়ে বড় আকার ধারণ করেছিল।

আইনের পুনর্গঠন : সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চীনে এসেছিল নতুন নতুন মানুষ, আর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নতুন রাজ্যাংশ। চীন একটি বিশাল দেশ। তার ভেতরে বিভিন্ন জাতি উপজাতিগুলির মধ্যে অমিল ছিল অনেক। বিভিন্ন ধরনের মানুষদের একটা সুশাসনের মধ্যে আনতে হলে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী আইন ব্যবস্থা চালু করা

দরকার। কিন্তু ঐ কাজ করা ছিল শাসন কার্যের সবচেয়ে দুরুহ কাজ। এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল তাং যুগে। এই যুগেই চীনের প্রচলিত আইনগুলিকে সংশোধন করে কঠিনভাবে বলবৎ করার চেষ্টা হয়। কনফুসিয়াসের দর্শনের উপর ভিত্তি করে এই আইন রচিত হয়েছিল। চীন সমাজের প্রচলিত প্রথাকে এবং কনফুসিয়াসের পালনীয় আচরণ বিধিকে এক সঙ্গে করে এই আইন রচিত হয়েছিল। আইনকে শুধু রচনা করলেই হয় না। তাকে বলবৎ করতে হয়। এই কাজটি করেছিলেন সম্রাট তাই সুং। তিনি রাজকর্মচারীদের কাজকর্ম তদারক করার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করেন এবং কঠোর হাতে শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মেধাবী ছাত্রেরা প্রশাসনে চাকুরী পেত। উন্নত গুণমানের প্রশাসক ছিল বলেই তাং সম্রাটরা আইন সুন্দরভাবে বলবৎ করতে পেরেছিলেন।

একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের সাহায্যে দেশ শাসনের জন্য চীনা সাম্রাজ্যকে দশটি **তাও** বা প্রদেশে, প্রত্যেক তাওকে কয়েকটি **চৌ** বা জেলা এবং প্রত্যেক চৌকে কয়েকটি **সিয়েন** বা পরগণায় বিভক্ত করা হয়েছিল। শাসনের শীর্ষে সম্রাট ও নিম্নস্তরে আমলাতন্ত্র নতুন আইনকে হাতিয়ার করে দেশ শাসন করতেন। দেশের ঐক্য যেন অটুট থাকে—এটিই ছিল শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য।

তাং যুগের শিক্ষা, কাব্য, অঙ্কন ও মুদ্রণ : তাং যুগে **শিক্ষার অভূতপূর্ব** বিস্তার ঘটেছিল। তাং সম্রাটরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাং রাজধানী চাঙ্গানে একটি মস্তবড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। পঠনপাঠনের বিষয় ছিল বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র, কনফুসিয়াসের মতবাদ, তাওবাদ (Taoism), দর্শন, ইতিহাস, আইন, গণিত, ভেষজ, কাব্য, অঙ্কন, মুদ্রণ ইত্যাদি। এই সময়ে হান বংশের ইতিহাস ও সু-মা চিয়েন রচিত- চীনের ইতিহাস বিশেষভাবে পঠিত হত। তাং যুগেই রচিত হয়েছিল ইতিহাস গ্রন্থ 'লি তুং' এবং সংবিধানের উপর রচনা 'তুং তিয়েন'।

তাং যুগে কাব্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এই যুগের দুই কবি ছিলেন লি পো (Li Po) ও তু ফু (Tu Fu)। লি পো ছিলেন ভবঘুরে। তিনি নদী, পাহাড় ও গ্রামাঞ্চলের প্রকৃতি নিয়ে অসংখ্য গীতি কবিতা লিখেছেন। তু ফু কবিতা লিখেছেন জীবনের দুঃখ কষ্ট, সাফল্য-ব্যর্থতা, আনন্দ-বেদনা



চীনের শিল্প

নিয়ে। লি পো ছিলেন স্বভাবকবি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতা লিখতেন। তু ফু তাঁর মত স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন না। এযুগে আরও অনেক কবি ছিলেন যেমন পো চুই, সুং চি ওয়েন, চাং -চিয়েন প্রমুখ।

তাং যুগে চীনের অঙ্কন শিল্পের উন্নত হয়েছিল। চীনের নিজস্ব শিল্পচর্চা গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও চীনের শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল। চীনের বিভিন্ন স্থানের, বিশেষ করে চাঙ্গান ও লোয়াং শহরের বৌদ্ধ মন্দিরগুলির দেয়ালে এ যুগের অসাধারণ চিত্রশিল্প দেখা যায়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন **উ তাও সুয়ান**।

তাং যুগে চীনে পৃথিবীর সর্বপ্রথম **ছাপাশিল্প** গড়ে ওঠে। প্রথমে কাঠের ফলকে হরফ চিহ্নিত করে ব্লক বানিয়ে ছাপা হত। বৌদ্ধগ্রন্থগুলি এইভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে নানা ধাতুর নির্মিত হরফ তৈরী করা হয়। বিনামূল্যে বৌদ্ধ রচনাগুলিকে বিলি করার জন্য চীনের মুদ্রণ ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে। এর ফলে চীনের সর্বত্র ব্লক প্রস্তুত ও বই ছাপানো একটি জাতীয় শিল্পের রূপ নিয়েছিল। বিশ্বের প্রাচীনতম ছাপা গ্রন্থ হল একটি বৌদ্ধ সূত্র। তা তাং আমলের দান। কানসুর (Kansu) তুনহুয়াং (Tunhuang) গুহা থেকে এই রচনাটিকে আবিষ্কার করা হয়।

চা : চা চীনের একটি প্রাচীন পানীয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে চীনে চা পানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাং যুগে চা পানীয় রূপে সমস্ত মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অষ্টম শতাব্দীতে চা পানের প্রচলন সব থেকে বৃদ্ধি পায়। খুব সম্ভব এই সময়েই দক্ষিণ থেকে উত্তরে চা পানের প্রসার ঘটে এবং গরিবদের মধ্যেও চা পানীয় রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মেই চায়ের চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

তাং যুগের বাণিজ্য ও কৃষিকাজ : তাং যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল

উন্নতি হয়েছিল এবং তার ফলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাং যুগে চীনে বহির্বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য রকম বৃদ্ধি পেয়েছিল। চীনের রাজধানী চাঙ্গান ও দক্ষিণের বড় বন্দর **ক্যান্টন** ছিল চীনের আমদানি-রপ্তানীর বড় কেন্দ্র। ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ, মধ্যএশিয়া, ইরান, বাইজানটাইন সাম্রাজ্য, কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক দেয়া-নেয়া ছিল। চীন থেকে রপ্তানী করা হত রেশম, মশলা, চীনা মাটির বাসন, কাগজ ও চা। রেশম, চীনা মাটির বাসন, কাগজ ও চা শিল্প ছিল চীনের সবচেয়ে বড় শিল্প। চীনে আমদানি হত হাতির দাঁত, চন্দনকাঠ, তামা ও ধূপ। তাছাড়া, আমদানি হত জানোয়ারের চামড়া ও শিং, গন্ধদ্রব্য ও কচ্ছপের খোলস। চীনে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তাং যুগে বিভিন্ন স্থানে খাল কাটা হয়েছিল। এই সময়ে বেশীর ভাগ মানুষ গ্রামে থাকত। কৃষিকাজই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। কৃষির উন্নতির জন্য এই সময়ে গরিব কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন করা হয়েছিল এবং কর ব্যবস্থাকে সরল করা হয়েছিল। তাং যুগে কৃষকদের অধীনে ছিল ছোট ছোট জমি এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তারাই ছিল সে জমির মালিক। পতিত জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হত। মিলেট, চাল, চা, আখ ছিল প্রধান কৃষিজ ফসল। এই সময়ে রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সরকার কৃষিকাজের উৎসাহ দিত এবং সময়ে সময়ে কৃষিকাজের সংস্কার করা হত। সেচের উন্নতি করা, সঠিক কর নির্ণয় ও জমি বন্টনের মাধ্যমে কৃষি সংস্কার— এই তিনটি কাজের দ্বারা তাং যুগে কৃষির প্রচুর উন্নতি হয়েছিল।

চীনে বৌদ্ধধর্ম ঃ প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে চীনে প্রবেশ করেছিল। তাং যুগে বৌদ্ধধর্ম চীনে বিশেষ প্রসারলাভ করেছিল বলে চীনের ইতিহাসে এই যুগকে বৌদ্ধ যুগ বলা যেতে পারে। সম্রাট কাও সুং -এর উপদেষ্টা এক রমনী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট সুয়ান সুং ও তাঁর জীবনের শেষ পর্বে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে **হুই নেং** নামে এক দার্শনিক বৌদ্ধধর্মকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে চীনের সাংস্কৃতিক জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থগুলি চীনা ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

জাপান-কোরিয়া-আন্নামে চীনা সভ্যতার বিস্তার : চীনের সভ্যতা প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। কোরিয়া, জাপান, আন্নাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশের সংস্কৃতি চীনা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কোরিয়ার রাজপরিবারের সন্তানরা চীনে লেখাপড়া শিখতেন। কোরিয়া চীনের সামরিক শক্তিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেও তার সংস্কৃতিকে রুখতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম চীন থেকে কোরিয়া হয়ে জাপানে প্রবেশ করেছিল। চীন থেকেই বৌদ্ধধর্ম আন্নামে প্রবেশ করেছিল। এই সমস্ত দেশের ধর্ম, সাহিত্য, লিপিমালা, পোশাক, রীতিনীতি, আইন-কানুন সব কিছু চীনা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাং যুগেই চীন থেকে কাগজের ব্যবহার সমরখন্দে প্রবেশ করেছিল। রেশম ও সোনা-রূপার, চিত্রকলার কিছু দিক আরবরা শিখেছিল চীনের কাছ থেকে। এইভাবে সভ্যতার আদান-প্রদানের দিক থেকে তাং যুগ চীনকে এক উচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

সুং যুগ (৯৬০-১২৮০ খ্রীঃ) : তাং বংশের পতনের সঙ্গে চীনের ঐক্য ভেঙ্গে যায় এবং চীনে অরাজকতা শুরু হয়। এই অরাজকতা প্রায় তিপ্পান্ন বছর ধরে চলে। তারপর ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুং বংশের রাজত্ব শুরু হয়। এই সময়ে আবার চীনে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুং যুগের সংস্কার, গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা : সুং যুগে সব রকম শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কৃষকরা। এই কৃষক বিদ্রোহের নেতা ছিলেন **ওয়াং সিয়াও পো** (Wang Hsiao-po)। তাঁর নেতৃত্বে কৃষকরা সম্পদের সমান বন্টন দাবী করে। বাধ্য হয়ে সম্রাট **চেন সুং** (Jen Tsung) তাঁর প্রধানমন্ত্রী **ওয়াং আন-শি**'কে (Wang An-Shih)দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধনের জন্য নির্দেশ দেন। ১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ওয়াং সংস্কার মূলক কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন। চীনের ইতিহাসে তা **ওয়াং আন-শির সংস্কার** নামে বিখ্যাত। ওয়াং আন-শি-র সংস্কার কার্যের তিনটি প্রধান দিক ছিল। সেগুলি হল বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ, কৃষি সংস্কার ও কৃষি ঋণদান এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত কর ব্যবস্থার পুনর্বন্টন।

বাণিজ্যের রাষ্ট্রীকরণ : ওয়াং আন-শি-র সংস্কার কার্যের ফলে চীনের

ই:৭

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, বিশেষ করে শস্য বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হল। ওয়াং নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেক জেলায় শস্যের গোলা বানাতে হবে। কৃষকরা উৎপন্ন শস্য দিয়ে প্রথমে সরকারের খাজনা মেটাবে। অবশিষ্টাংশ দিয়ে তাদের মেটাতে হবে সেই জেলার মানুষের চাহিদা, আর তার পরে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা সরকারের কাছে বিক্রী করে দিতে হবে, কিংবা সরকারের নির্দেশে ফসলহীন অঞ্চলে পাঠাতে হবে। এর ফলে সরকার পেল স্থির রাজস্ব আর কৃষকরা পেল ফসল বিক্রী করার নির্দিষ্ট বাজার। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে আইন করে বড় বড় ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা হ্রাস করা হল। এর পর থেকে জিনিসপত্র ন্যায্য দামে বিক্রী হতে লাগল।

কৃষি সংস্কার ও কৃষি ঋণদান : কৃষিকাজের শুরুতে কৃষকরা চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করত মহাজনের কাছ থেকে। মহাজনদের কবল থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য সরকার ২% হারে অর্থাৎ ১০০ টাকায় ২ টাকা সুদ এই হারে কৃষকদের বাৎসরিক ঋণদানের ব্যবস্থা করল। কৃষকরা উৎপন্ন ফসল দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ শোধ করতে পারত।

সম্পত্তিকর : কৃষকদের উপর কর ব্যবস্থাকে সরল করা হল। জমি জরিপ করে জমির উর্বরতা অনুসারে জমিকে বিভক্ত করে কৃষকদের কর ধার্য করা হল। প্রত্যেকের জমি ও সম্পত্তির তালিকাও প্রস্তুত হল। এইভাবে জমির সমস্ত হিসাব স্থির করে সমস্ত জমি কৃষকদের মধ্যে সমানভাগে বন্টন করে দেওয়া হল। কোন জমি থেকে কত খাজনা গ্রহণ করা হবে তা প্রতি বছর স্থির করা হত। এই কাজের সাথে সাথে সরকার থেকে বেশী সম্পত্তির মালিকদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করে তাদের উপর কর বসিয়ে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হত। চীনের এই সম্পত্তি কর সমকালীন ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : এই সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। সাহিত্যের মধ্যে দেখা দিয়েছিল দুটি ভাব—পুরনোকে জানার আগ্রহ ও নতুনকে আবিষ্কারের তীব্র ইচ্ছা। সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চীনের মুদ্রণ শিল্পও এগিয়ে চলে। সার্বিকভাবে সংস্কৃতির এই জাগরণ সুং যুগের এক

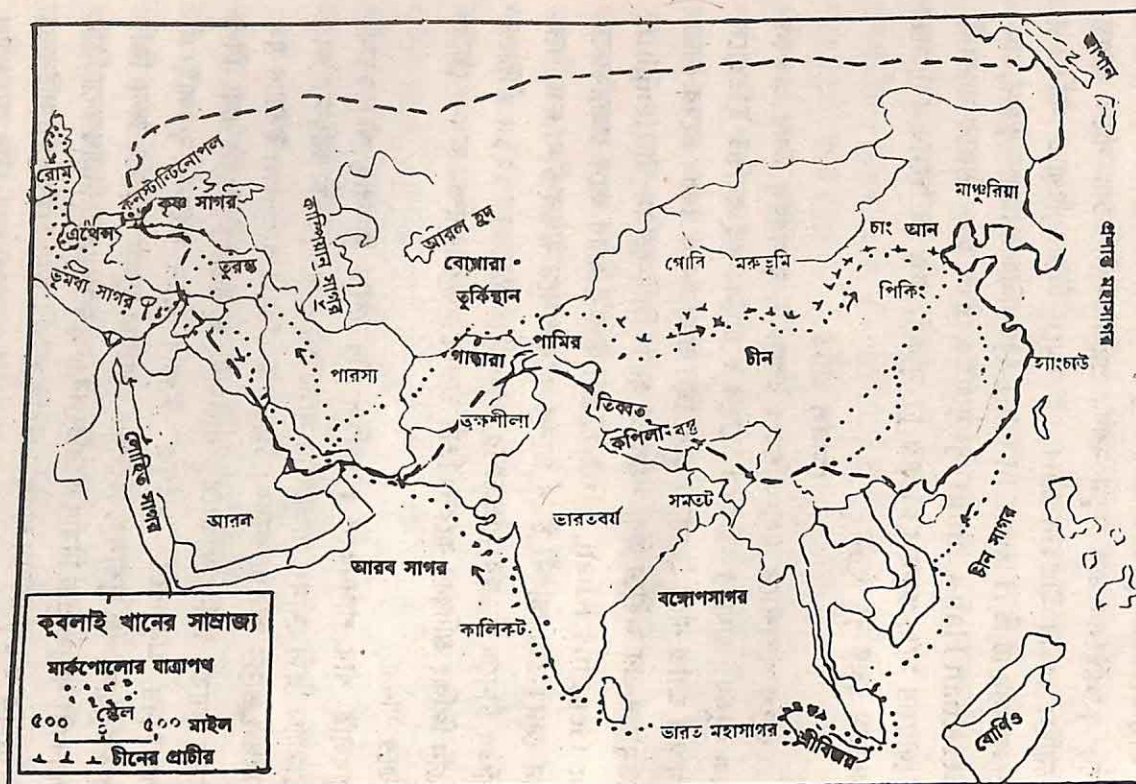
বিশিষ্ট অবদান।

সুং যুগে নব্য কনফুসীয় মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন **চু সি**। তিনি বৌদ্ধ ও তাও মতবাদের মূল বিষয়গুলি কনফুসীয় মতবাদের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন এক নতুন দর্শন। প্রাচীন দর্শন চর্চার সাথে আরম্ভ হয়েছিল প্রাচীন ইতিহাস চর্চা। এই সময়ে চীনের বিখ্যাত গীতিকার ছিলেন **সিন চি-চি** (Hsin Chi-Chi) এবং নাট্যকার ছিলেন **কুয়ান হান-চিং** (Kuan Han-Ching)। সুং যুগেই সর্বপ্রথম অঙ্কন শিল্পকে সরকারী উদ্যোগের মধ্যে আনা হয়। **কুও চুং সু** এবং **কুও সি** ছিলেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুই শিল্পী।

মোঙ্গল জাতি

দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার রুক্ষমাটি, বৃক্ষবিরল ঊষর অঞ্চলে এক দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতির উদ্ভব হয়েছিল। এই জাতিই ইতিহাসে **মোঙ্গল জাতি** নামে বিখ্যাত। তারা ছিল ভ্রাম্যমান ও বর্বর। এদের নেতা **তেমুজিন**-এর অধীনে এরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। তিনি **চেঙ্গিস খাঁ** (Jenghiz or Genghis Khan, 1162-1227) উপাধি ধারণ করে রাজ্যবিজয়ে মন দেন। তাঁর বাহিনী চীনে প্রবেশ করে প্রথমে উত্তর চীন এবং পরে দক্ষিণ চীনকে নিজের সাম্রাজ্যের মধ্যে নিয়ে আসেন। ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিকিং অধিকার করেন। তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ফিরে যান।

কুবলাই খাঁর শাসনকাল : চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র কুবলাই খাঁ। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সম্রাট হন ও সম্পূর্ণ চীন অধিকার করে মোঙ্গল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। চীনে এই মোঙ্গল শাসনকাল **ইউয়ান যুগ** নামে খ্যাত। তিনি পিকিংয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং চীনা সম্রাটদের অনুকরণে "স্বর্গপুত্র" উপাধি ধারণ করেন। কুবলাই খাঁ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন সুশাসক ছিলেন। খাদ্যের সুষম বন্টনের জন্য তিনি সরকারী শস্যভাণ্ডার নির্মাণ করেছিলেন। নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ করে তিনি যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখিয়ে তিনি এক বিরল শাসনদক্ষতার নজির রেখেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল (১২৬০-১২৯৪ খ্রীঃ) মোঙ্গল শাসনের স্বর্ণযুগ।



কুবলাই খানের সাম্রাজ্য
মার্কপোলোর যাত্রাপথ
স্কেল
৫০০
৫০০ মাইল
চীনের প্রাচীর
রোম
কনস্টান্টিনোপল
কৃষ্ণ সাগর
এথেন্স
তুরস্ক
ভূমধ্য সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
আরল হ্রদ
বোখারা
তুর্কিস্থান
পারস্য
আরব
লোহিত সাগর
আরব সাগর
গান্ধারা
পামির
তক্ষশীলা
তিব্বত
কপিলাবস্তু
ভারতবর্ষ
সমতট
বঙ্গোপসাগর
কালিকট
ভারত মহাসাগর
শ্রীবিজয়
বোর্ণিও
চীন সাগর
চীন
গোবি মরুভূমি
চাং আন
পিকিং
হ্যাংচাউ
মাঞ্চুরিয়া
জাপান
প্রশান্ত মহাসাগর

ইউয়ান যুগে বৌদ্ধ ধর্ম ঃ কুবলাই খাঁর শাসনকালে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বৌদ্ধদের তাওবাদীরা অনেক সময়ে সহ্য করতে পারত না। ফলে অনেক সময়ে সাম্রাজ্যের ভেতর গোলযোগের সৃষ্টি হত। তখন বাধ্য হয়ে সম্রাটকে বিদ্রোহী ও গোলযোগকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হত।

মার্কোপোলো ঃ কুবলাই খাঁ ও তৎকালীন চীনদেশের বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলোর ভ্রমণ কাহিনী থেকে। সমৃদ্ধশালী চীনের প্রাচীর বেষ্টিত পিকিং ছিল পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর শহর। তিনি হাংচাউয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। হাংচাউ ছিল পিকিং-এর চেয়েও সুন্দর। মার্কোপোলো কুবলাই খাঁর দরবারের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষের সময় চীনের প্রজাদের কর দিতে হত না। তিনি পরে দেশে ফিরে যান।

● মধ্যযুগের জাপান ●

সূচনা ঃ জাপান এশিয়ার মূল স্থলভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপপুঞ্জ। পৃথিবীর পূর্বতম দেশ জাপান, তাই জাপানী ভাষায় তার নাম নিপ্পন (Nippon), অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দেশ (The land of the Rising Sun)।

মধ্যযুগের আদিপর্বে জাপানের সমাজ ও অর্থনীতি ঃ মধ্যযুগের শুরু থেকেই জাপানের সমাজ কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। সমস্ত জাপানের রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা কয়েকটি পরিবার আত্মসাৎ করে রেখেছিল। আর সেই ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবারগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী, যেমন ইয়ামাটো, সোগা, তোমা, হিজেন ইত্যাদি। এদের মধ্যে ইয়ামাটো গোষ্ঠীই ক্রমশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং খ্রীষ্টীয় শতকের শুরুতে অন্যান্য সব গোষ্ঠীর উপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করে। এই প্রভুত্ব স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাপানের রাজবংশ।

জাপানের ধর্ম ছিল শিন্টো ধর্ম। এই ধর্ম জাপানীদের প্রকৃতিকে ভালবাসতে আর শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিল। ইয়ামাটোরা সূর্যকে প্রকৃতির

সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস বলে পূজা করত।

জাপানের গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রভাবের ফলে তার অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কৃষকদের জমি ও তার ফসল অনায়াসেই এক একটি গোষ্ঠীর দখলে চলে আসে। রাজাকে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করে গোষ্ঠীপতিরা ও তাদের বন্ধু আঞ্চলিক প্রভুরা ক্রমশ বেড়ে উঠত। তারা অর্থব্যয় করত বিলাসব্যসনে আর বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায়। কৃষকদের শোষণ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করে যখন আঞ্চলিক প্রভুরা শক্তিশালী হয়, তখন শোষণ ও শাসনের নতুন কাঠামো তৈরী হয়। **গোষ্ঠীতন্ত্রই জাপানে সামন্ততন্ত্রের বুনিয়াদ** হয়ে দেখা দিয়েছিল।

মিকাডোর প্রাধান্য ঃ জাপানের প্রধান গোষ্ঠী ইয়ামাটোর নেতা হলেন সম্রাট। জাপানে সম্রাটকে বলা হয় **তেনো। মিকাডো** তাঁর কাব্যিক নাম। মিকাডো রাজবংশ পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজবংশ। জাপানীদের মতে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৬৬০ বছর আগে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। মিকাডো ছিলেন জাপানের একচ্ছত্র শাসক এবং অন্যদিকে, শিন্টো নামে প্রচলিত ধর্মের সর্বোচ্চ পুরোহিত। অতএব, ধর্ম ও রাজ্যশাসন এই দুই নিয়ে তৈরী হয়েছিল মিকাডোর ক্ষমতা।

এইভাবে নিজেকে সমাজের অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরে মিকাডো হলেন দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক। তিনি ছিলেন সমস্ত জমি ও রাজস্বের অধিকারী। সমস্ত খেতাব ও সম্মান প্রদানের কর্তা। সমস্ত বড় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তিনি পৌরোহিত্য করতেন। তিনিই ছিলেন গোষ্ঠীপতিদের প্রধান। যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের অধিকারী ও প্রধান পুরোহিত। পরে শোগুন নামে এক সামরিক পরিবারের আবির্ভাবে মিকাডোর ক্ষমতা হ্রাস পায়।

চীনের সাথে বন্ধন ঃ চীনের সভ্যতা খুব প্রাচীন। কোরিয়ার মধ্য দিয়ে এই সভ্যতা জাপানে প্রবেশ করেছিল। এই অর্থে চীন, কোরিয়া ও জাপান একই সভ্যতার দান। ভাষা, বর্ণমালা, শিল্প ও দর্শন-- এই সব কিছু জাপান গ্রহণ করেছিল চীনের কাছ থেকে। চীনের কাছ থেকে জাপান শিখল ব্রোঞ্জের ব্যবহার। মূল্যবান পাথর, আয়না, তলোয়ার ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান। শিখল ভাষা ও অক্ষরমালা সম্বন্ধে ধারণা ও নগর পত্তনের

নিয়ম। ভাষার সাথে জাপানী দরবার গ্রহণ করেছিল বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জাপানে প্রবেশ করেছিল কনফুসিয়াসের নীতিধর্ম, তাওতত্ত্ব, চিত্র ও অন্যান্য শিল্পকলা। যুদ্ধবিধ্বস্ত চীন থেকে বহু মানুষ পালিয়ে গিয়ে জাপানে বসতি বিস্তার করেছিল। তাদের মধ্যে ছিল কৃষক, কারিগর, বণিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও শিক্ষিত মানুষ। তারা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান, তৈজস পত্রাদি নির্মাণের কৌশল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সমর বিজ্ঞান, আইনকানুন, ওজনের ব্যবহার, কালপঞ্জী নির্ণয় ও মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি।

জাপান তাং যুগের চীনকে তার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল। তাং সভ্যতার প্রভাবে জাপান প্রচলন করল নতুন কর ব্যবস্থা, নতুন ভূমি বন্দোবস্ত ও নতুন স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা। ৬৪৫ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এইসব পরিবর্তন হয়েছিল। জাপানী ইতিহাসে একে বলে **তইকাওয়া** বা 'মহান সংস্কারের যুগ'। অন্যের যা কিছু ভাল তা অনায়াসে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে জাপান দ্বিধা করেনি। এই মানসিকতাই ছিল জাপানের উন্নতির সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি।

মিকাডো বনাম জাপানের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ঃ অষ্টম শতক থেকে জাপানে গোষ্ঠীগুলির প্রাধান্য বাড়তে থাকে। এর আগে মহান সংস্কার দ্বারা মিকাডোকে সর্বশক্তিমান করে জাপানকে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে আনার চেষ্টা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, সম্রাট সমস্ত জমির মালিক, সূর্যদেবীর সন্তান, শিন্টো ধর্মের শীর্ষ পুরোহিত ও সকল ক্ষমতার উৎস। অতএব, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধর্মবিরুদ্ধ। অথচ বাস্তবে শেষ পর্যন্ত এই দাবী টিকল না। বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভিজাত পরিবাররা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ ভাগ করে নিল। বেতনের পরিবর্তে পদস্থ কর্মচারীরা নিষ্কর জমি ভোগ করতে লাগল। আর বৌদ্ধ মঠগুলি বিশাল জমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠল। এই সময় থেকে স্থানে স্থানে আঞ্চলিক প্রভুরা বৌদ্ধ ও শিন্টো মঠগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে প্রচুর সৈন্যসামন্ত রাখতে শুরু করল। দেশের ভেতরে ও রাজধানীতে গোলযোগ হলে এই সমস্ত সৈন্যরা এসে দেশের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখত। এইভাবে চলতে থাকলে রাজশক্তি দুর্বল হয় ও রাজার অধঃস্তন

শক্তিগুলি প্রবল হয়ে ওঠে। জাপানেও তাই হয়েছিল। ফুজিওয়ারা, টায়রা, মিনাসোটো, হোজো নামে বিভিন্ন ক্ষমতাশালী পরিবারগুলি একের পর এক জাপনের ক্ষমতা কার্যত দখল করে।

এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে জাপানে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই কাঠামো ত্রয়োদশ শতকে দাঁড়িয়েছিল এইরকম। রাষ্ট্রের সবচেয়ে উপরে ছিলেন নিষ্ক্রিয় সম্রাট। তাঁর উপর অভিভাবকত্ব করত ফুজিওয়ারা। ফুজিওয়ারা ছিল শোগুনের নিয়ন্ত্রণে আর শোগুনকে নিয়ন্ত্রণ করত হোজো। এর থেকে জন্ম নেয় একটি শক্তিশালী সামরিক শ্রেণী। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বল হওয়ার পেছনে এই শ্রেণীর অবদান অনেকখানি।

শোগুনেট ঃ জাপানের ক্ষমতাচক্রে শোগুনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শোগুনের কাজ ছিল আসলে সম্রাটের প্রধানমন্ত্রীত্ব করা। কিন্তু রাজাকে আড়াল রেখে দেশের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছিল এই শোগুনরা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী আক্রমণের মুখে দেশকে রক্ষা করতে না পারার জন্য শোগুনের পতন ঘটে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট তাঁর হৃতক্ষমতা ফিরে পান।

সামুরাই ঃ সুবিধাভোগী ও যোদ্ধৃশ্রেণীর মানুষ না থাকলে সামন্ততন্ত্রের রূপ পূর্ণ হয় না। জাপানেও এই শ্রেণীর লোক ছিল। তাদের বলা হত সামুরাই। তাদের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। তারা কায়িক শ্রম না দিয়ে, রাজস্বের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে অলসভাবে বেঁচে থাকত। যুদ্ধ করা, যাদের জীবিকা তাদের হাতে থাকে অস্ত্র। রাজস্বের ভাগ বসানোর অধিকার দিলে তাদের হাতে আসে অর্থ। কায়িক শ্রম না দিলে তারা হয় অলস, তাদের হাতে থাকে সময়। অস্ত্র, অর্থ ও উদ্বৃত্ত সময় এই তিন যাদের হাতে থাকে তারা ক্ষমতার দিকে হাত বাড়ায়। সামুরাইরাও তাই করেছিল। সামন্ততন্ত্রের প্রাণপুরুষ ছিল তারা, শাসন ক্ষমতায় ছিল তাদের বিপুল প্রতাপ। সামুরাইরাই ছিল মধ্যযুগের জাপানের সবচেয়ে বড় শক্তি। পরবর্তীকালে সামুরাইরা অনেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

বুশিডো ঃ সামুরাইদের জীবন পদ্ধতির কতগুলি নীতি ছিল। এগুলিকে বলা হত বুশিডো। বুশিডো হল যোদ্ধাদের জীবনচর্চার নীতি। টাকুগোয়া শোগুনেটের সময়ে এইসব নীতি কার্যকর হয়। এইসব নীতির মধ্যে ছিল

সততা, উদারতা, নম্রতা, নিষ্ঠা, সাহস, সংযম, সম্ভ্রমবোধ ইত্যাদি। ইউরোপে নাইটদের জন্য এইরকম নীতি ছিল। তাকে বলা হত শিভ্যালরি। বুশিডো হল জাপানের শিভ্যালরি। জাপানের শাসনভার দীর্ঘকাল ধরে যোদ্ধাদের হাতে ন্যস্ত ছিল। যোদ্ধাদের সৎ ও ভদ্রভাবে গড়ে তোলাই ছিল বুশিডোর লক্ষ্য।

● কী শিখলে ●

ক) চীন ঃ-

- চীনে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠে।
- তাং ও সুঙ যুগে নানা উন্নতিমূলক সংস্কার ঘটে। আইনের পুনর্গঠন, শিক্ষা, কার্য্য, অঙ্কন ও ছাপা কাজে অগ্রগতি, চা, কৃষি ও বাণিজ্য; চীন, কোরিয়া ও জাপানে চীনের বৌদ্ধধর্ম, সভ্যতার প্রসার।
- সুঙ যুগে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ, কৃষি সংস্কার, কৃষি ঋণদান, নতুন কনফুসীয় মতবাদ।
- নানা জাতির অবদানে চীন সভ্যতা পরিপুষ্ট।
- মোঙ্গলদের শাসন– কুবলাই খান-- মার্কোপোলো।

খ) জাপান ঃ গোষ্ঠীর প্রাধান্য, সামন্ততন্ত্র, চীনের সঙ্গে যোগাযোগ, মিকাডো বনাম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস।
শিন্টো ধর্ম, শোগুন, মিকাডো, সামুরাই, বুশিডো।

অনুশীলনী

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

ক) চীনের প্রথম সম্রাট ছিলেন— তাই সুং/শি হুয়াং তি/কাও সু/সুয়াং সুং।

খ) তাও যুগের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল— (১) চীনের সঙ্গে জাপানের সন্ধি স্থাপন করা, (২) চীনের সঙ্গে তুর্কীস্তানের সীমানা ভাগ করে নেওয়া, (৩) চীনের সাম্রাজ্য সীমা বাড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ করা।

গ) চা শিল্পের আদি কেন্দ্র ছিল— হুনান/ক্যান্টন/পিকিং/রোম।

ঘ) যে চীনা পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ভারতে আসেন তিনি হলেন– লিপো/পোচুই/কুবলাই খান/ফাহিয়েন।

ঙ) সুং যুগে কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল কারণ— (১) তারা বেশী পরিমাণে শিক্ষার দাবী করে, (২) তারা বেশী পরিমাণে গৃহ নির্মাণের আন্দোলন করে, (৩) তারা দেশের সম্পদের সমান বন্টন দাবী করে, (৪) তারা রাজাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়।

চ) মোঙ্গল যে নেতা গোটা চীন জয় করেন তার নাম ছিল— চেঙ্গিস খাঁ/কুবলাই খাঁ/তৈমুরলঙ্গ/মার্কোপোলো।

ছ) জাপানের প্রাচীন ধর্মকে বলা হয়— বৌদ্ধধর্ম/শিন্টোধর্ম/খ্রীষ্টানধর্ম/ইসলামধর্ম।

জ) মিকাডোর ক্ষমতা নষ্ট করে— শোগুন সামরিক কর্মচারী/গোষ্ঠী নেতারা/রাজন্যবর্গ/ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীরা।

ঝ) সামুরাইদের প্রধান পেশা ছিল— কৃষিকাজ করা/চিত্রাঙ্কন করা/যুদ্ধ করা/ব্যবসা-বাণিজ্য করা।

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) তাং রাজারা কত বছর চীনে রাজত্ব করেন?

খ) ঐ যুগের আইনের প্রধান ভিত্তি কী ছিল?

গ) আইনের পুনর্গঠন কোন রাজাদের আমলে ঘটে?

ঘ) চীনের তাং যুগের শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

ঙ) চীনের আমদানী রপ্তানীর প্রধান বন্দর ছিল কোনটি?

চ) আরব দেশের লোকেরা কাগজ তৈরীর কাজ কোন দেশ থেকে শিখেছিল?

ছ) জাপানের শিভ্যালরি কাকে বলা হোত?

জ) জাপানের অপর নাম কী?

ঝ) শিন্টো ধর্মের প্রধান উপাস্য কী?

ঞ) মিকাডো দেশের কেন সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন?

ট) জাপানে মহান সংস্কারের যুগকে কী নামে অভিহিত করা হয়?

ঠ) জাপানের প্রথম রাজধানীর নাম কী?

ড) তাং যুগের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান কী?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) তাং তাইসুংকে তাং যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন?

খ) চীনের নতুন আইনের মূল দিকগুলি কী কী?

গ) জাপানের জনসাধারণ কয়ভাগে ও কী কী ভাগে বিভক্ত ছিল?

ঘ) চেঙ্গিস খাঁ কী জন্য বিখ্যাত?

ঙ) কুবলাই খাঁর অন্য ধর্মের প্রতি কেমন মনোভাব ছিল?

চ) 'বুশিডো' গোষ্ঠীর আদর্শ কী ছিল?

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) তাং যুগের বাণিজ্য/কৃষিকাজ/মুদ্রণ/শিক্ষা/অঙ্কন/আইন সংক্রান্ত সংস্কার লেখ।

খ) জাপান-কোরিয়া-আন্নামে চীনের সভ্যতার বিস্তারের বর্ণনা দাও।

গ) চীনে কৃষি সংস্কার কিভাবে করা হয়?

ঘ) চীনে ওয়াং আন শির সংস্কারের মূল দিকগুলি বর্ণনা কর।

ঙ) কুবলাই খাঁ কিভাবে মোঙ্গল শক্তিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন?

চ) জাপানের আদিপর্বে ঐ দেশের কৃষকদের অবস্থা কেমন ছিল?

ছ) জাপান কিভাবে চীনদেশ থেকে উপকৃত হয়?

জ) গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে রাজশক্তির কী অবস্থা হয়েছিল?

ঝ) শোগুনেটরা কিভাবে ক্ষমতা ভোগ করত?

ঞ) চীনে সামুরাইদের কর্তৃত্ব কেমন ছিল?

।। দশম অধ্যায় ।।

● মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ●

ক) পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষ ঃ

হূণ আক্রমণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঃ ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পেছনে একটা বড় কারণ হল হূণ আক্রমণ। হূণরা ছিল এক দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি। মধ্য এশিয়ায় ছিল তাদের আদি বাস। তাদের একটি শাখা ইউরোপে গিয়ে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তাদের আরেকটি শাখা মধ্য এশিয়ার অক্ষু নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। ইতিহাসে তারাই **শ্বেত হূণ** নামে পরিচিত। শ্বেত হূণরাই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল।

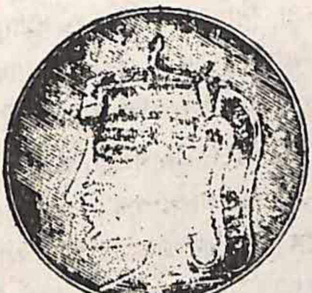
চতুর্থ গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে হূণরা মধ্য এশিয়া থেকে এসে ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত তাদের প্রতিরোধ করেন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অখণ্ডতাকে রক্ষা করেন। ভারতবর্ষে প্রথম প্রকৃত হূণ আক্রমণ হয়েছিল ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ফলে, পারস্যের মধ্য দিয়ে কাবুল হয়ে হূণরা জলস্রোতের মত ভারতে এসে পৌছায়। শেষ শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাট বুধগুপ্তের রাজত্বকালেই হূণদের প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারা শিয়ালকোট, পূর্ব মালব প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। হূণরা যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পেরেছিল তার একটা কারণ হল এই যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভেতর এই সময়ে আত্মকলহ দেখা দিয়েছিল এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সুযোগ-সন্ধানী হয়ে পড়েছিল। ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহতি ভেঙ্গে পড়ে।

হূণ আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। আর তার স্থলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দেখা দেয় বেশ কয়েকটি ছোট রাজ্য। উত্তর ভারতে গড়ে উঠে মালবের যশোধর্মনের রাজ্য, পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের অধীনে মগধ ও মালবের পূর্ব অংশ, গৌড়, মৌখরি বংশের অধীনে কনৌজ ও পুষ্যভূতি বংশের অধীনে থানেশ্বর রাজ্য। পশ্চিম ভারতে কাথিয়াবাড় অঞ্চলে বলভী রাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যে চালুক্য রাজ্য

গড়ে উঠে। পরবর্তীকালে হূণরা ভারতীয় জনসমষ্টিতে মিশে যায়। হূণরক্তকে বহন করেই আরও পরে **গুর্জর প্রতিহার** প্রভৃতি রাজপুত জাতিগুলি ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

গুপ্ত পরবর্তী যুগের ভারত—হর্ষবর্ধন ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় একশো বছর পরে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন **পুষ্যভূতি** বংশের একজন রাজা। তাঁর নাম **হর্ষবর্ধন**। তিনি প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতকে নিজের ক্ষমতার মধ্যে এনেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তিনি নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি।

হর্ষবর্ধন ছিলেন পাঞ্জাবের অন্তর্গত **থানেশ্বরের**রাজা **প্রভাকরবর্ধনের** পুত্র। তাঁর ভগিনীর নাম **রাজ্যশ্রী**। তিনি ছিলেন **কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের** পত্নী। হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা **রাজ্যবর্ধনের** রাজত্বকালে **মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজ শশাঙ্কের** মিলিত আক্রমণে কনৌজরাজ গ্রহবর্মন পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। রাজ্যবর্ধন ভগিনীকে রক্ষা করার জন্য কনৌজ আক্রমণ করেন। তাঁর হাতে দেবগুপ্ত পরাজিত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গৌড় বা কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের চক্রান্তে নিহত হন। এইভাবে একই সাথে থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসন শূন্য হল। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে আঠারো বছর, বয়সে হর্ষবর্ধন **শিলাদিত্য** উপাধি গ্রহণ করে উভয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। রাজা হয়ে হর্ষবর্ধনের প্রথম কাজ হল ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করা। রাজ্যশ্রী কনৌজের বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে বিন্ধ্যারণ্যে চলে গিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধন সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। এরপর তিনি থানেশ্বর থেকে কনৌজে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত



হর্ষবর্ধন

করেছিলেন। কনৌজ থেকে প্রায় একচল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

হর্ষবর্ধনের রাজ্য বিস্তার

হর্ষবর্ধনের পররাষ্ট্র নীতির একটি লক্ষ্য ছিল রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী গৌড়াধিপতি শশাঙ্ককে শাস্তিদান। সেই উদ্দেশ্যে তিনি **মালবরাজ মাধবগুপ্ত** এবং **কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার** সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু শশাঙ্ককে তিনি পরাজিত করতে পারেননি। হর্ষবর্ধনের রাজ্য উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী, পশ্চিমে বলভী থেকে পূর্বে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁকে দাক্ষিণাত্য জয়ে বাধা দেন। মোটামুটিভাবে সারা উত্তর ভারতকে তিনি এক শাসনে বেঁধেছিলেন। কিন্তু গুপ্তযুগের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্যকে ফিরিয়ে আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব : গুপ্তোত্তর যুগের অরাজকতা থেকে উত্তর ভারতকে রক্ষা করা নিঃসন্দেহে হর্ষবর্ধনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। কিন্তু তাঁর রণনৈপুণ্য, শাসনদক্ষতা প্রজাবাৎসল্য, বিদ্যোৎসাহিতা ও ধর্মানুরাগ তাঁকে অন্য এক কৃতিত্বের অধিকারী করেছে। তাঁর মধ্যে অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা ছিল। তিনি **নাগানন্দ, রত্নাবলী** ও **প্রিয়দর্শিকা** নামে তিনটি সংস্কৃত নাটক লেখেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন **বাণভট্ট**। তাঁর রচিত **হর্ষচরিত** ও **কাদম্বরী** সংস্কৃত সাহিত্যের দুই অমূল্য সম্পদ। তিনি ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু। হর্ষবর্ধন শৈব ছিলেন, পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। হর্ষবর্ধন সম্বন্ধে অনেক কথা বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' এবং চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর রচনা থেকে আমরা জানতে পারি।

হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ ও বিবরণ : হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। তিনি তের বছর (৬৩০-৬৪৩ খ্রীঃ) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। নেপাল থেকে শুরু করে মুলতান ও সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বৌদ্ধ তীর্থগুলি তিনি পরিদর্শন করেন। কামরূপ, বাংলাদেশ, নালন্দা, বোধগয়া, বারাণসী, প্রয়াগ সমস্ত অঞ্চল তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

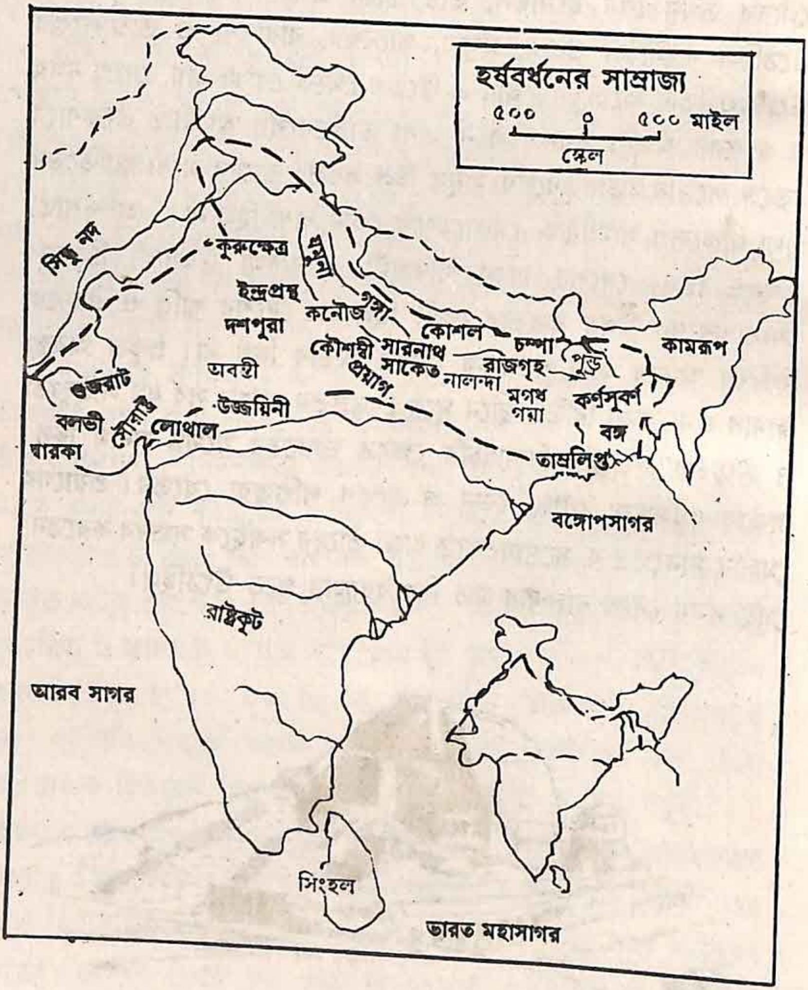
হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন **'ভারত ভ্রমণ কথা'** নামক একটি গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি সে যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের

এক অমূল্য উপাদান। তাঁর বর্ণনায় উত্তর ভারতের যে চিত্র আমরা পাই, তা হূণ আক্রমণে বিপর্যস্ত ভারতের চিত্র। হূণ আক্রমণে বহু নগরী ধ্বংস হয়েছিল। বহু মঠ ও মন্দির নিশ্চিহ্ন হয়েছিল । পাটলিপুত্রের গৌরব তখন ম্লান হয়েছিল, তার স্থানে প্রধান নগর হিসাবে গড়ে উঠেছিল কনৌজ। প্রয়াগ, মথুরা, থানেশ্বর, বারাণসী ও তাম্রলিপ্তের উল্লেখও তিনি করেছেন। আর এ উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, দেশে নগর ও বন্দরের অভাব তখন ছিল না এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি। ভারতবর্ষের মানুষ ছিল সরল। তাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা থাকলেও সামাজিক মেলামেশার কোন বাধা ছিল না। অস্পৃশ্যতা তখনও ছিল। দেশের রাজা পরিশ্রমী ও অদম্য উৎসাহী ছিলেন। জনসাধারণের উপর করভার বেশী ছিল না। দেশের শান্তি ও ঐক্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য শাসকের চেষ্টার অভাব ছিল না। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য রাজা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। তখন সর্ব ধর্ম সহিষ্ণুতা ও উচ্চতর পর্যায়ের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ভারতের যথেষ্ট সুনাম ছিল। রাজার ধর্মসভায় বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যেতেন। প্রয়াগের মেলায় দানক্ষেত্র বা সন্তোষক্ষেত্রে রাজা তাঁদের সবাইকে সমাদর করতেন। সেই সময় দেশে নালন্দার মত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।



নালন্দা

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় : তৎকালীন ভারতবর্ষে অনেক বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। গুপ্ত


হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
৫০০ ০ ৫০০ মাইল
স্কেল
সিন্ধু নদ
কুরুক্ষেত্র
যমুনা
ইন্দ্রপ্রস্থ
কনৌজ
গঙ্গা
দশপুরা
কোশল
চম্পা
কামরূপ
কৌশম্বী
সারনাথ
সাকেত
রাজগৃহ
পুণ্ড্র
নালন্দা
অবন্তী
গুজরাট
প্রয়াগ
মগধ
গয়া
কর্ণসুবর্ণ
উজ্জয়িনী
বলভী
সৌরাষ্ট্র
লোথাল
দ্বারকা
বঙ্গ
তাম্রলিপ্ত
বঙ্গোপসাগর
রাষ্ট্রকূট
আরব সাগর
সিংহল
ভারত মহাসাগর

সম্রাটদের আনুকূল্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করত। এখানে বৌদ্ধ দর্শন, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, ন্যায়, সাংখ্য, ব্যাকরণ, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। এখানে একশ জন শিক্ষক ছিলেন, আর তাঁরা সবাই ছিলেন সন্ন্যাসী। এখানে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। যোগ্যতার কঠোর পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হত। প্রবেশের পরও ছাত্রদের কঠোর নিয়ম পালন করতে হত। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। হিউয়েন সাঙ এখানে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেশের রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের দানে উহার ব্যয়ভার মেটানো হত। তাঁদের অর্থেই গড়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গ্রন্থাগার এবং শিক্ষাদানের জন্য একশত কক্ষ। এত বড় বিশ্ববিদ্যালয় যে কোন দেশের গৌরব। ভারতবর্ষের উন্নত জ্ঞানচর্চার এটিই ছিল সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। বর্তমান বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনার কিছুদূরে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

খ) অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষ – হর্ষ পরবর্তী যুগ :—

ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব : হূণ ও অন্যান্য বৈদেশিক আক্রমণে ভারতে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল হর্ষবর্ধন তাকে প্রতিহত করে উত্তর ভারতের ঐক্যকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর. ঐ রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। এর পর প্রায় পাঁচশো বৎসর ধরে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়।

কয়েকটি রাজপুত রাজ্য : ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হওয়ায় অষ্টম শতাব্দী থেকেই উত্তর পশ্চিম ভারতে রাজপুত রাজ্যসমূহের উদ্ভব ঘটে।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রাজপুত রাজ্যগুলি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। রাজপুতদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজবংশ হল দক্ষিণ রাজপুতানার গুর্জর প্রতিহার, বারাণসী ও অযোধ্যা অঞ্চলের গাহাড়ওয়াল বা গাড়োয়াল (পরবর্তী কালের রাঠোর)। এছাড়াও ছিল, সম্ভর ও আজমীর অঞ্চলের চৌহান, জেজাকভুক্তির (পরবর্তী বুন্দেলখণ্ড) চন্দেল এবং মালবের পারমার বংশ। রাজপুত জাতিগুলির মধ্যে কেউ কেউ ছিল সূর্যের

উপাসক। তারা ছিল বৈদেশিক বংশোদ্ভূত। আবার, কেউ কেউ নাগপূজা করত। তারা ছিল আদিম ভারতীয় বংশধর।

গুর্জর প্রতিহার বংশের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় পর থেকেই রাজপুতদের রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয়। গুর্জররা ছিল মধ্য এশিয়ার মানুষ। ভারতবর্ষে এসে তারা ভারতীয় ধারাকে গ্রহণ করে। অষ্টম শতাব্দী থেকে গুর্জরদের উত্থান শুরু হয়। গুর্জর রাজা প্রথম নাগভট ও পরে দ্বিতীয় নাগভটের নেতৃত্বে গুর্জররা বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে। কনৌজে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরে বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল বংশ ও মালবে পারমার বংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এইভাবে দুটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। চন্দেল বংশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ও পারমার বংশ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। রাজা ভোজ ছিলেন পারমার বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।

মধ্য ভারতের একটি ছোট রাজ্য হল **কলচুরি** বা **চেদি** রাজ্য। বিলাসপুর, জব্বলপুর ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য রাজ্যগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল গুজরাটের সোলাঙ্কি রাজ্য ও আজমীরের চৌহান রাজ্য। সোলাঙ্কি রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম মুলরাজ। আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ে এই রাজ্য দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। চৌহান বংশের শেষ রাজা ছিলেন তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহম্মদ ঘোরীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। মহম্মদ ঘোরীর হাতে আরেকটি আঞ্চলিক রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল। সেটি হল বর্তমান উত্তর প্রদেশের গাহাড়ওয়াল রাজ্য। রাজা গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। বারাণসী ছিল তাঁর রাজধানী। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী এ রাজ্য জয় করেন।

রাজপুত সমাজে সামন্ততন্ত্র ঃ রাজপুত রাজ্যগুলিতে যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। রাজপুত সমাজ ছিল গোষ্ঠী-ভিত্তিক। গোষ্ঠীর প্রধানই ছিলেন রাজা। তিনি ছিলেন জমি-সম্পত্তির মালিক। যেমন, ইউরোপে রাজা ছিলেন ভূ-সম্পত্তির মালিক বা ওভারলর্ড **(Overlord)**। তিনি তাঁর অধীনস্থ সামন্ত প্রভুদের নানা রকম খেতাব দিতেন। বড় সামন্তরা পেতেন মহাসামন্ত,

মণ্ডলেশ্বর ইত্যাদি খেতাব। তাদের অধীনে থাকত ছোট ছোট সামন্ত বা উপসামন্ত। তাদের উপাধি হত ঠাকুর, রাজা, সামন্ত ইত্যাদি। এইসব সামন্ত প্রভুরা বেতন পেতেন না। পেতেন জমি, যার রাজস্বকে আত্মসাৎ করে তাঁরা বেঁচে থাকতেন। তাঁরা প্রয়োজনমত রাজদরবারে হাজির থাকতেন বা প্রতিনিধি রাখতেন এবং রাজার সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী রাজাকে নিয়মিত রাজস্বের একটি অংশ পাঠাতেন। রাজার কাজে অনুগত থাকা আর রাজার হয়ে যুদ্ধ করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। রাজা দুর্বল হলে তাঁরা বিদ্রোহ করতেন। ফলে রাজা তাদের বশে রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে রাজপুত রাজাদের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হত।

ত্রিমুখী লড়াই ঃ হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘটনা হল কনৌজ নিয়ে তিন শক্তির লড়াই। এই তিন শক্তি হল বাংলার পাল, মালবের গুর্জর প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। সে যুগে মনে করা হত যে, কনৌজ হচ্ছে উত্তর ভারতের রাজধানী—রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র। অতএব রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভে ইচ্ছুক যে কোন রাজশক্তিই কনৌজের দিকে হাত বাড়াবার বাসনা করত। কনৌজের শাসক চক্রায়ুধ ছিলেন বাংলার রাজা ধর্মপালের আশ্রিত। তাঁকে পরাজিত করে প্রতিহার রাজা নাগভট নিজের ক্ষমতা কায়েম করার চেষ্টা করেন। নাগভট ধর্মপালকেও পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু কনৌজে প্রতিহারদের আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। রাষ্ট্রকূটদের দৃষ্টি ছিল কনৌজের উপর। অতএব রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ আক্রমণ করেন এবং সেখান থেকে প্রতিহারদের বিতাড়িত করেন। ধর্মপালও সাময়িকভাবে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল পুনরায় আর্যাবর্তে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করা কারও পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

ক্ষুদ্র রাজ্য ও তাদের অধীনস্থ রাজ্য সমূহ ঃ সপ্তম শতাব্দীতে দুর্লভবর্ধন নামে জনৈক সামন্ত কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন। তিনিই কাশ্মীরে কার্কট বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের রাজা ছিলেন ললিতাদিত্য। তিনি

কনৌজের রাজা যশোবর্মনকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য জয় করেন। কাশ্মীরের মত আরেকটি স্বাধীন আঞ্চলিক রাজ্য হল বাংলার পাল রাজ্য। কামরূপ ও উড়িষ্যাতেও এই রকম ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলি ছিল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মানচিত্রে আঞ্চলিকতা ও অনৈক্যের প্রতীক। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের মত বড় সাম্রাজ্যের যুগ শেষ হয়ে এসেছিল।

গ) বাংলাদেশ ঃ

মধ্য যুগের বাংলা ঃ বাংলাদেশের তিনটি ভাগ ছিল। উত্তরবঙ্গ হল প্রথম ভাগ। এর নাম ছিল **বরেন্দ্রভূমি বা পুন্ড্রবর্ধন**। দ্বিতীয় ভাগ হল পশ্চিমবঙ্গ যাকে বলা হত **রাঢ়দেশ**। তৃতীয় ভাগ ছিল পূর্ববঙ্গ যাকে বলা হত শুধু **বঙ্গ**। এই তিনটি ভাগকে একত্র বলা হয় বাংলাদেশ।

শশাঙ্ক ঃ বাংলাদেশের প্রথম সর্বভারতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য নরপতি ছিলেন শশাঙ্ক। তিনি সম্ভবতঃ মগধের গুপ্তবংশীয় রাজা মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাসেনগুপ্তের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে তিনি গৌড়দেশে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। স্বাধীন গৌড় রাজ্যের শাসক বলে তিনি **গৌড়াধীপ** বলে পরিচিত হন। তাঁর প্রকৃত উপাধি ছিল **নরেন্দ্রাদিত্য**। তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। তাঁর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি নামক স্থানে। এই অঞ্চলেরই নামকরণ হয়েছিল **কর্ণসুবর্ণ** বা কানসোনা। তাঁর সময়েই বাংলাদেশে প্রথম প্রকৃত শক্তিশালী রাজ্য গঠিত হয় এবং বাংলাদেশ সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মানচিত্রে নিজের স্থান করে নেয়। শশাঙ্কের রাজ্য উড়িষ্যার গঞ্জাম হয়ে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্য বিস্তারের সূত্র ধরেই কনৌজের মৌখরি বংশীয় রাজা গ্রহবর্মন এবং পরে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। তিনি ছিলেন বৌদ্ধবিদ্বেষী। একথা লিখেছেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ। এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। কারণ, হিউয়েন সাঙ নিজেও কর্ণসুবর্ণে দশটি বৌদ্ধমঠ দেখেছিলেন। আর্যাবর্তে বাঙ্গালী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন শশাঙ্ক। আর এ স্বপ্নকে আংশিকভাবে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন

তিনি। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এইটিই।

পাল ও সেন রাজবংশ : শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অনেকদিন বাংলাদেশে অরাজকতা চলেছিল। বাংলার ইতিহাসে একে **মাৎস্যন্যায়** বলা হয়। এরকম অরাজক অবস্থা চলতে থাকলে দেশের জনগণ গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসার জন্য নির্বাচিত করে। এইভাবে গোপাল পাল বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজারা হলেন **ধর্মপাল** (৭৮০-৮১৫ খ্রীঃ) ও তাঁর পুত্র **দেবপাল** (৮১৫-৮৫৫ খ্রীঃ)। ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন ও রাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। পাল রাজাদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার রাজাদের উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে লড়াই চলেছিল। পাল রাজারা প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

একাদশ শতকে **সামন্ত সেন** ও তাঁর পুত্র **হেমন্ত সেন** নামে দুই-ভাগ্যান্বেষী বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে একটি রাজত্ব স্থাপন করেন। শোনা যায়, তাঁরা নাকি কর্ণাটক থেকে এদেশে এসেছিলেন। এই বংশের রাজা বিজয় সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাল রাজাকে পরাজিত করে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ জয় করেন। বাংলার পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মানুরাগী, কিন্তু সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে কুলীন প্রথার প্রবর্তন করেন। শেষ সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের (১১৭৮-১২০৫ খ্রীঃ) সময়ে **বক্তিয়ার খিলজী** বাংলাদেশ জয় করেন।

পাল ও সেন যুগের জীবন ও সমাজ ধর্ম ও শিক্ষা : বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাবের অনেক আগেই বাংলার সমাজব্যবস্থা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণে বিভক্ত হয়ে যায় ও তাদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা চালু হয়। সমাজ বর্ণবিভক্ত হলে পরস্পরের সঙ্গে স্বাভাবিক মিলনের পথ বন্ধ হয় ও সমাজের দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে অনেক আড়ষ্টতা আসে। এই নিয়মেই সমাজে অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছিল। কুলীন হওয়ার ফলে কিছু মানুষের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ফলে সমাজে ভেদাভেদ দেখা দেয়। সমাজে তখন সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, দান, প্রায়শ্চিত্ত বিধান ইত্যাদি নানা রকম দেশাচার ও

কুলাচার নিয়ে মানুষ ব্যস্ত থাকত। বর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলার মানুষ তখন অধিকাংশই গ্রামে বাস করত। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বাঙ্গালীরা ছিল সৎ, অমায়িক, কষ্টসহিষ্ণু ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগী। আহার ও বেশভূষায় তাদের কোন বাহুল্য ছিল না। সমাজে মানুষের খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, শাক-সব্জি, ঘি-দুধ ইত্যাদি। পুরুষদের পোশাক ছিল খাটো ধুতি ও বিশেষ উৎসবে গায়ে চাদর, পায়ে খড়ম। মেয়েরা পরত শাড়ি, গায়ে ওড়না, কপালে টিপ ও চোখে কাজল। তখন মেয়েরা নানা রকম অলঙ্কার ব্যবহার করত– বাহুতে কেয়ুর, হাতে কঙ্কন, কটিতে মেখলা, পায়ে মল ও নূপুর। দেশে চামড়ার জুতোর তখনও প্রচলন হয়নি। সমাজে মেয়েরা শ্রদ্ধার পাত্রী হলেও তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না।

বাংলাদেশ ছিল কৃষিনির্ভর। তা সত্ত্বেও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। বাংলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত– পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র। বাণিজ্য বাড়লেও অবশ্য সমাজে অর্থের লেনদেন বেশী বাড়েনি। সমাজে দরিদ্র মানুষের অভাব ছিল না। ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। পুরুষরা দাবা ও পাশার খেলায় ও মেয়েরা কড়ি খেলার মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ করত। কবির লড়াই, যাত্রাভিনয়, মল্লযুদ্ধ, শিকার, নৌকাচালনা, তীর-ধনুকের খেলা-- এই ছিল তখন প্রধান আমোদ-প্রমোদ।

হিন্দু সমাজ শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। শাক্তগণ পশুবলি দিতেন আর বৈষ্ণবরা নিরামিষ আহার করতেন। পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি হয়েছিল। রাজা জয়পালের সময়ে বিক্রমশীলা বিহারের (বিশ্ববিদ্যালয়ের) অধ্যক্ষ বাঙ্গালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেন রাজারা নিজেরা ছিলেন শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের উপাসক। বল্লাল সেন হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য নেপাল, আরাকান, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারক

প্রেরণ করেছিলেন।

পাল ও সেন যুগে বাংলার সংস্কৃতির অন্যান্য দিকে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছিল। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, কারুশিল্প ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় বাঙ্গালীরা যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেছিল। বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি তখন পৃথিবীর বহুদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার নিদর্শন ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আবিষ্কৃত হয়েছে। শূলপাণি, বীটপাল ও ধীমান ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও ধাতুমূর্তি শিল্পী।

পাল ও সেনযুগে বাংলাদেশে শিক্ষার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' পালযুগে রচিত বাংলার একটি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ। সেন যুগে বল্লাল সেন রচনা করেছিলেন দুটি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ-- 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর'। সেন রাজারা কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের রাজসভায় ছিল **পঞ্চরত্ন -- শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ধর ও জয়দেব**। ধোয়ী রচনা করেছিলেন কালিদাসের মেঘদূত অনুকরণে **পবনদূত**। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী নিয়ে লিখেছিলেন গীতগোবিন্দ, যার পদলালিত্য আজও মানুষকে মুগ্ধ করে।

উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমন্বয় : পাল ও সেনযুগে উচ্চতর শিক্ষা বিকাশলাভ করেছিল আর তার সাথে দেখা দিয়েছিল ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বয়। পাল রাজাদের উৎসাহে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর বাংলার পাহাড়পুরের কাছে সোমপুর, মগধে ওদন্তপুর এবং ভাগলপুরে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় তখন বিখ্যাত ছিল। উচ্চশিক্ষা সংস্কৃতি সমন্বয়ের পথ খুলে দেয়। তখন তিব্বত, নেপাল ও সুবর্ণভূমি থেকে বহু ছাত্র এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে আসত। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশের পাহাড়পুর ও মহাস্থান নগর পরিভ্রমণ করে সেখানে ২০ টি সংঘারামে ৭০০ বিদ্যার্থীকে শিক্ষালাভ করতে দেখেছিলেন। উচ্চ শিক্ষার এই পরিবেশ ছিল বলে এবং রাজশক্তি বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ও পরমতসহিষ্ণু ছিল বলে দেশে সংস্কৃতি সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারত :

দক্ষিণ ভারত বলতে বোঝায় বিন্ধ্য পর্বত ও নর্মদা নদীর দক্ষিণ অংশ।

এর পশ্চিমে রয়েছে আরব সাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। এর পূর্বে রয়েছে পূর্বঘাট পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগর। এর দক্ষিণে আছে ভারত মহাসাগর। এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ অঞ্চলে চারটি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। এগুলি হল– চালুক্য, পল্লব, চোল ও রাষ্ট্রকূট। এগুলি হর্ষবর্ধনের সময়ে এবং পরে আঞ্চলিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

চালুক্য : বর্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাতাপি অঞ্চলে চালুক্যদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৬৪২ খ্রীঃ)। তিনি দাক্ষিণাত্যে হর্ষবর্ধনের অভিযান বিধ্বস্ত করেন। মহীশূর থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তিনি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। উত্তর ভারতের মালব ও গুজরাটের রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। পল্লবদের তিনি পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মনের হাতে তিনি নিজেই পরাজিত ও নিহত হন। এর পরে রাষ্ট্রকূটদের হাতে চালুক্য রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পল্লব : পল্লবদের রাজত্বকাল হল ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত। কাঞ্চী শহরে ছিল তাদের রাজধানী। পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন প্রথম নরসিংহ বর্মন (৬৩০-৬৬৮ খ্রীঃ)। তিনি চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনবার যুদ্ধে পরাজিত করে চালুক্য রাজধানী বাতাপি দখল করেন এবং মহামল্ল উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সিংহলের সিংহাসনে নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে বসান। তাঁর সময়ে হিউয়েন সাঙ পল্লব রাজ্য পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানে তিনি অসংখ্য বৌদ্ধমঠ ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী এবং বহু জৈন ও হিন্দু মন্দির পরিদর্শন করেন। পল্লবরাজা প্রথম জয়সিংহ বর্মনের মৃত্যুর পর পল্লবশক্তি দুর্বল হতে থাকে। রাষ্ট্রকূটদের আঘাতে পল্লব রাজ্য ধ্বংস হয়।

শিল্প-স্থাপত্যে চালুক্য ও পল্লবদের অবদান : চালুক্যরাজারা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাদামীর গুহামন্দির, চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের সঙ্গমেশ্বর মন্দির এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বিরূপাক্ষ মন্দির চালুক্য স্থাপত্য শিল্পের সবচেয়ে বড় নিদর্শন।

পল্লবযুগে পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণের রীতি চালু হয়েছিল। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সময়ে পাদুকোঠা গুহাচিত্রগুলি খোদিত হয়েছিল। নরসিংহবর্মন মহামল্লও শিল্পের সমাদর করতেন। তাঁর সময়ে বিরাট বিরাট শিলাখণ্ড খোদাই করে নানা মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল। এইগুলি মামল্লপুরের রথ নামে বিখ্যাত। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন কর্তৃক নির্মিত মহাবলিপুরমের সপ্তরথ মন্দির, কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির এবং মামল্লপুরমের রথগুলি পল্লব স্থাপত্য শিল্পের বড় নিদর্শন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে দ্রাবিড় শিল্প-রীতির বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে। চালুক্য যুগের বাদামীর প্রস্তরখোদিত মন্দিরগুলিতে ও পল্লবযুগের কৈলাসনাথের মন্দিরটিতে দ্রাবিড় শিল্পরীতির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলিতে যে শিল্পের নিদর্শন ছিল তার তুলনা উত্তর ভারতে একমাত্র শিল্পে লক্ষ্য করা যায়।



পল্লব স্থাপত্য

চোলঃ চোল যুগের সামুদ্রিক প্রাধান্য ঃ সমুদ্রে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য দরকার নৌ-শক্তি। চালুক্য ও পল্লবরাজারা সামুদ্রিক প্রধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেননি। ফলে তাঁরা স্থলবাহিনীর উপর নির্ভর করে নিজেদের রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। চোল রাজারা স্থলবাহিনী ছাড়াও এক বিরাট নৌ-বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। নবম শতাব্দীতে তাঞ্জোরে চোল রাজ্যের উত্থান ঘটে। দশম শতাব্দীর শেষে ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমে চোল রাজা প্রথম রাজরাজ একটি শক্তিশালী নৌ-বহর তৈরি করে চোলদের সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যে তিনি মালদ্বীপ ও সিংহলের উত্তরাঞ্চলের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। চোলরাজারা করমণ্ডল ও মালাবার উপকূল রক্ষার ব্যাপারে তাদের নৌ-বাহিনীকে কাজে লাগাতেন। রাজেন্দ্র চোল নামে এক পরাক্রমশালী চোল

রাজা তাঁর শক্তিশালী নৌ-বহরের সাহায্যে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। তিনি সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশের বিরুদ্ধেও একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। শৈলেন্দ্ররাজ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের একটি অংশের উপর চোল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(ঙ) ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র ঃ জমির মালিকানা ও জমি থেকে রাজস্বের আয়কে আত্মসাৎ করার উপর দাঁড়িয়ে থাকে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো। মৌর্য-উত্তর যুগ থেকে ব্রাহ্মণ ও সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত মানুষদের ভূমিদান প্রথা শুরু হয়েছিল। গুপ্তযুগ থেকেই তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ ও বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত রাজকর্মচারীদের পদগুলি পুরুষানুক্রমিক ভোগ দখলের মধ্যে চলে যাচ্ছিল। বিভিন্ন বিষয়, ভুক্তি ইত্যাদির অধিপতিরা নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে একদিকে জমি ও রাজস্বের উপর নিজেদের অধিকার কায়েম করছিলেন। অন্যদিকে, তারা সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদি উপাধি ধারণ করে শাসন ক্ষমতার অনেকটাই নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলছিলেন। বড় বড় শাসনকর্তারা নিজেদের বংশকে মর্যাদা দানের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিততন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। কোন রাজার বংশ চন্দ্র বা সূর্য অথবা রঘু ইত্যাদি কোন পৌরাণিক নায়ক বা অলৌকিক শক্তি থেকে শুরু হয়েছে একথা বললে রাজবংশের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। এই কাজটি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দিয়ে রাজারা করিয়ে নিতেন। এর জন্য ব্রাহ্মণদের অনেক সময় অনেক ভূ-সম্পত্তি দেওয়া হত। রাজা ও ব্রাহ্মণের মধ্যে এইভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠত। এর ফল হত এই যে, শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শাসন অনেকটা দুর্বল হত এবং রাজা তাঁর শাসন ক্ষমতাকে অধস্তনের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হতেন। শাসকের হাত থেকে দেশের অভ্যন্তরভাগ শাসনের ক্ষমতা ব্রাহ্মণ ও প্রশাসকদের হাতে এইভাবেই চলে যেত। গুপ্ত যুগের পর সারাভারত ব্যাপী যে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারেনি তার জন্য এই সামন্ততন্ত্রের প্রভাব অনেকখানি দায়ী।

● কী শিখলে ঃ

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনে যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও অশান্তি দেখা দেয় তার থেকে হর্ষবর্দ্ধন ভারতকে রক্ষা করেছিলেন।
- হর্ষের পর আঞ্চলিক ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠে; কিন্তু রাজপুত কিংবা পাল সাম্রাজ্য কেউ সারা ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে নাই। নিজেদের মধ্যে অনৈক্যই প্রধান কারণ।
- দাক্ষিণাত্যেও পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চোল পৃথক পৃথকভাবে শক্তিশালী হলেও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে ও একে অপরের শিকার হয়। তাঁদের শিল্প স্থাপত্য কীর্তি অতুলনীয়।
- অনেক রাজা/সম্রাট পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন।
- দেশে শিক্ষাদীক্ষার চরম উন্নতি হয়েছিল। দেশ বিদেশে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। সংস্কৃতি সমন্বয় ঘটে।

।। অনুশীলনী।।

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) গুপ্ত বংশের পর ভারতে অরাজকতা কতদিন চলেছিল-- প্রায় ২০০ বছর/ ১০০ বছর/৫০ বছর/১০০০ বছর।

(খ) হূণদের বাসস্থান ছিল-- রোম/মধ্য এশিয়ায়/আরবদেশে/পারস্যদেশে।

(গ) হর্ষবর্ধন জন্মেছিলেন— গুপ্তবংশে/মোঙ্গল বংশে/হূণ বংশে/পুষ্যভূতি বংশে।

(ঘ) দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন— চালুক্য বংশের রাজা/কর্ণসুবর্ণের রাজা/ থানেশ্বরের রাজা/মালবের রাজা।

(ঙ) হিউয়েন সাঙের লিখিত পুস্তকের নাম— রামায়ণ/ভারতভ্রমণ কথা/রত্নাবলী /পুরাণ।

(চ) পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন— হর্ষবর্ধন/কুমারগুপ্ত/গোপাল/শশাঙ্ক।

(ছ) ত্রিমুখী লড়াইয়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল— থানেশ্বর/কনৌজ/দিল্লী/আগ্রা।

(জ) শশাঙ্কের রাজধানী ছিল— কর্ণসুবর্ণ/উজ্জয়িনী/পাটনা/কনৌজ।

(ঝ) জয়দেবের রচিত কাব্যের নাম— দানসাগর/রামচরিত/গীতগোবিন্দ/রামায়ন।

(ঞ) শিলাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন— হর্ষবর্ধন/নাগভট/ধর্মপাল/হিউয়েন সাঙ।

২। সময়ক্রম অনুসারে সাজাও এবং ঐসব ব্যক্তি/ শব্দগুলি কীজন্য বিখ্যাত তার উল্লেখ কর।

ফাহিয়েন, হর্ষবর্ধন, শ্বেতহূণ, দ্বিতীয় পুলকেশী, স্কন্দগুপ্ত, শীলভদ্র, রাজেন্দ্র চোল, অতীশ দীপঙ্কর, মুহম্মদ ঘোরী, ধর্মপাল।

৩। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) গুপ্ত বংশের শেষ সম্রাট কে ছিলেন ?

(খ) শ্বেত হূণ কাদের বলে ?

(গ) গৌড়ের অধিপতি কে ছিলেন ?

(ঘ) হর্ষবর্ধন উত্তরে/দক্ষিণে/পূর্বে/পশ্চিমে সাম্রাজ্যের সীমা কতদুর বিস্তৃত করেন?

(ঙ) রাজপুতদের কোন বংশ প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ?

(চ) ত্রিমুখী লড়াইয়ে বাংলা/কনৌজ/মালব/রাষ্ট্রকূটদের রাজা কে কে ছিলেন?

(ছ) গৌড়ের প্রথম স্বাধীন রাজা কে ছিলেন?

(জ) গৌড়াধিপ/নরেন্দ্রাদিত্য কাকে বলা হয়?

(ঝ) বাণভট্ট কে ছিলেন?

(ঞ) সেন বংশের শেষ স্বাধীন রাজা কে ছিলেন?

(ট) বল্লাল সেনের লিখিত একটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ?

(ঠ) তাম্রলিপ্ত কী জন্য বিখ্যাত ছিল?

(ড) শীলভদ্র কে ছিলেন?

৪। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) হর্ষবর্ধনের শাসক হিসাবে কৃতিত্ব কোথায়?

(খ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী বিষয় পড়ানো হোত?

(গ) বিক্রমশীলা মহাবিহার সম্বন্ধে চারটি বাক্য লিখ?

(ঘ) হর্ষবর্ধন বিদ্যার সমাদর কেমন করতেন?

(ঙ) হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কী কী ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়?

(চ) 'ত্রিমুখী লড়াই' বলতে কী বোঝায়?

(ছ) বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের নাম কি ছিল?

(জ) 'মাৎসন্যায়' কী?

৫। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) হর্ষবর্ধন কীভাবে থানেশ্বর ও কনৌজের রাজা হন?

(খ) হর্ষবর্ধন কীভাবে শাসন চালাতেন বর্ণনা কর।

(গ) হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে ভারতের সামাজিক/আর্থিক/রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও।

(ঘ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া সম্বন্ধে দশটি বাক্য লিখ।

(ঙ) রাজপুত সমাজের সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(চ) কনৌজের ত্রিমুখী লড়াইয়ের ফলাফল কী হয়েছিল?

(ছ) শশাঙ্কের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি উল্লেখ কর।

(জ) পাল ও সেন যুগের বাংলার সামাজিক/আর্থিক/সাংস্কৃতিক/শিক্ষার পরিচয় দাও।

(ঞ) দাক্ষিণাত্যের চালুক্য/পল্লব/চোলদের রাজনৈতিক, শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে আলোচনা কর।

(ট) ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র গড়ে ওঠার কারণ ও ফলাফল কী ছিল?

।। একাদশ অধ্যায় ।।

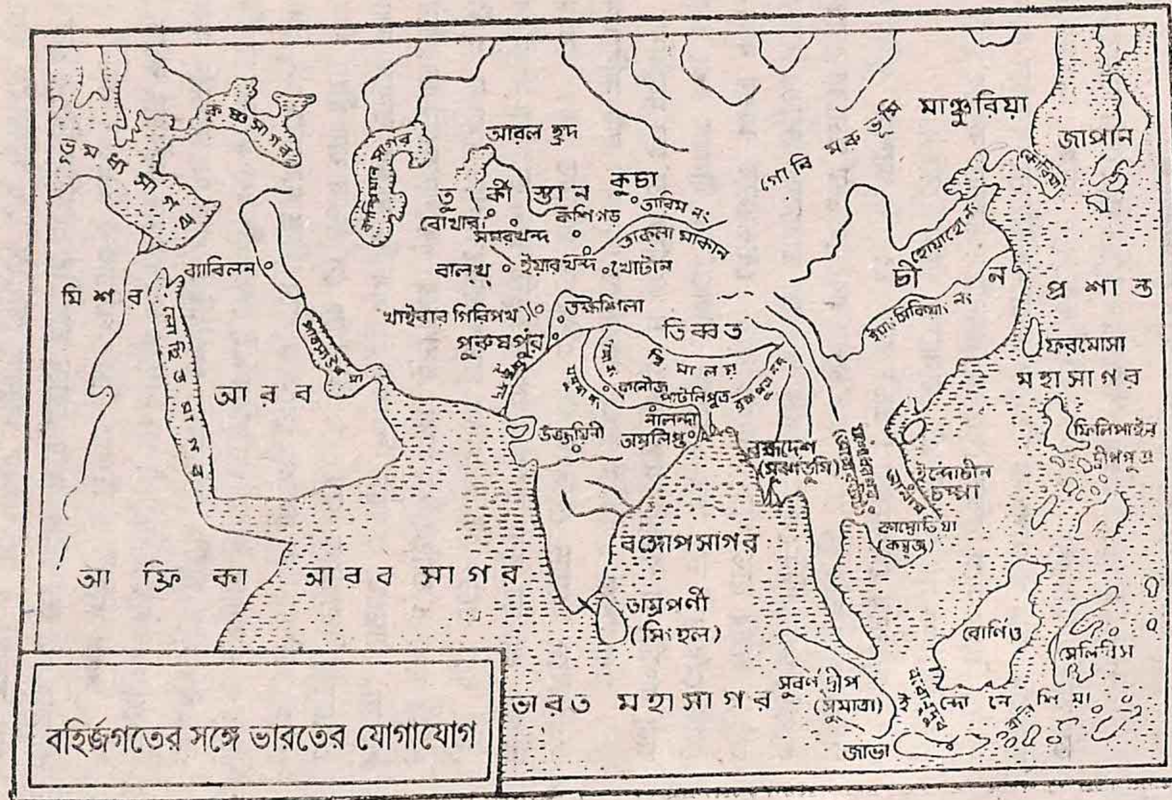
● বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ●

সূচনা– দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্বতমালা ও দুস্তর সমুদ্র ঘেরা ভারতবর্ষ। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ কোনদিন বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিজের সংযোগকে হারায়নি। চীন ও জাপানের মত দেশও তাদের ইতিহাসের কোন কোন পর্যায়ে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থেকেছে। এমনটি ভারতবর্ষে কখনও হয়নি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এই যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

স্থলপথে যোগাযোগ ঃ প্রাচীনকালে মহামতি **অশোক** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর দূত প্রেরণ করেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেদিন থেকে পৃথিবীর বহু দেশে ভারতের সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে ধর্মের হাত ধরে– বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করে। বৌদ্ধধর্মের দুটি ভাগ ছিল– সনাতন বৌদ্ধধর্ম হল **হীনযান** এবং তার অন্য শাখাটি, যা পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা হল **মহাযান**।

মধ্যএশিয়া ঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ সম্রাট **কণিষ্কের** রাজত্বকালে মহাযান বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়াতে প্রচারিত হয়। যেমন খোটান, কাশগড়, কুচা, তরফান, আকসু প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে মোঙ্গল, তুর্কী প্রভৃতি যাযাবর জাতিগুলির মধ্যে। কুষাণদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় বাণিজ্য, বৌদ্ধধর্ম, ভারতীয় শিল্পসভ্যতা, এমনকি সংস্কৃত ভাষাও মধ্য এশিয়াতে বিস্তারলাভ করে। সেখান থেকে সে প্রভাব যায় চীনে, চীন থেকে কোরিয়ায় এবং কোরিয়া থেকে জাপানে। কিন্তু কালক্রমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ও অন্যান্য কারণে সংস্কৃতির এই কেন্দ্রগুলি মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমির বুকে বিলীন হয়ে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেলস্টাইন মরু অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে ঐ সব নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।

সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ মধ্য এশিয়ার পথ ধরে চলার সময়ে এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করেন। এ সব অঞ্চলে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছিল। বিহারগুলিতে অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। মধ্য এশিয়ার



বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ

গোমতী বিহারে বৌদ্ধ শাস্ত্রের জ্ঞানলাভের জন্য চীন ও মধ্য এশিয়ার নানা স্থান থেকে জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থীরা আসতেন। এই সময়ে কুচা নগরে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারজীব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কাশ্মিরী, মাতা কুচা নগরের বাসিন্দা।

চীন ও তিব্বতে ভারতীয় প্রভাব ঃ মধ্য এশিয়া থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করে। সেখান থেকে যায় জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে। চীন দেশ থেকেও মানুষজন ভারতবর্ষে আসতেন বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে জানার জন্য। এই রকম পরিব্রাজক মানুষদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ ও ই-সিং। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে স্রং-স্যান গাম্পো নামে এক রাজা তিব্বতে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করেন। তাঁর দুই মহিষী ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে চীন ও নেপালের রাজপরিবারের কন্যা। তাঁরা দুজনেই বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে পড়ে রাজাও বৌদ্ধ হলেন। এর পরেই ভারতীয় ভাষা ও লিপি তিব্বতে গ্রহণ করা হয়। অনেকদিন ধরেই খোটান থেকে বৌদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতি তিব্বতে প্রবেশ করছিল। এই সংস্কৃতি এবার রাজার স্বীকৃতি পেল। তিব্বতে বৌদ্ধমঠ স্থাপন করা হল। তিব্বত রাজের আমন্ত্রণে বাঙ্গালী পণ্ডিত শান্ত রক্ষিত তিব্বতে যান। একাদশ শতকে গিয়েছিলেন বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বা অতীশ দীপঙ্কর**। তিনি নেপাল হয়ে মানস সরোবরের পথ ধরে তিব্বতে পৌঁছান। তাঁরই প্রেরণায় বহু গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। তিনি তের বছর তিব্বতে ছিলেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন। এই সময়ে বাংলাদেশে পাল রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁদের সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বহু তিব্বতী বৌদ্ধ ভারতে আসতেন এবং নালন্দা, বিক্রমশীলা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন। ভারতবর্ষ থেকে অনেকগুলি পুঁথি তাঁরা তিব্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আধুনিক যুগে তালীয় পণ্ডিত তুচ্চি ও বাঙ্গালী মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তিব্বতে ও নেপালে বহু ভারতীয় মূল গ্রন্থ আবিষ্কার করেন।

সুবর্ণভূমি ঃ সমুদ্রপথে যোগাযোগ ঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

দ্বীপপুঞ্জের সাথে ভারতের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। বাণিজ্যকে আশ্রয় করে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধজাতক, কথাসরিৎসাগর এবং এ-ধরনের প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় বণিকদের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য করতে যাওয়ার কথা আছে। তখন এ সমস্ত অঞ্চলকে বলা হত সুবর্ণভূমি। বাণিজ্যের ফসল এদেশগুলি থেকে আসত বলে ভারতবর্ষ তাদের নতুন নামকরণ করেছিল সুবর্ণভূমি। এই দেশগুলি ছিল উর্বর ও খনিজ সম্পদে পূর্ণ। সোনার ফসল ফলত এই সব দেশে। এই কারণেও এদের সুবর্ণভূমি বলা হত। এখানে ভারতীয়দের বসতি স্থাপিত হয়। ভারতীয়দের কাছ থেকে এই দেশগুলি পেয়েছিল ভারতীয় নাম– যেমন **কম্বোজ** (বর্তমান শ্যাম, থাইল্যান্ড ইত্যাদি), **চম্পা** (কোচিন চীন), **আন্নাম** (ইন্দোচীন), **সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, বর্ণিয়ো বা সুবর্ণদ্বীপ** ইত্যাদি। এই সব অঞ্চলে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। কোন কোন স্থানে বহু বছর হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করে। তার ফলে এখানে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। এই অঞ্চলকে 'বৃহত্তর ভারত' বলেও উল্লেখ করা হয়।

চম্পা : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দুটি রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হল চম্পা ও কম্বোজ। বর্তমান কোচিন চীনে চম্পা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রায় তেরশ বছর (১৫০-১৪৭১ খ্রীঃ) এই রাজ্য টিকে ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপুর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বারংবার মঙ্গোলদের আক্রমণে এই রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। চম্পা ছিল সম্পূর্ণভাবে একটি হিন্দু রাজ্য।

কম্বোজ : প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে কম্বোডিয়া থেকে মালয় হয়ে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত আরেকটি হিন্দু রাজ্যের কথা আমরা জানতে পারি তার নাম ছিল কম্বোজ। কম্বোজের প্রাচীন রাজধানী যশোধরপুর বা আঙ্কোর থোম (থোম মানে ধাম) নামে পরিচিত। কম্বোজের রাজা জয়বর্মন আঙ্কোর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে কম্বোজের রাজা যশোবর্মনের নামানুসারে এই নগর রাজধানীর নাম হয় যশোধরপুর। একবার চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁ এই নগরে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন।

আঙ্কোরথোম তৈরী শুরু করেছিলেন জয়বর্মন। শেষ করেছিলেন যশোবর্মন। নগরটি ছিল খুব মনোরম— পরিখা দিয়ে ঘেরা, পরিখার পর পাথর দিয়ে তৈরী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। নগরটির আয়তন ছিল চতুষ্কোণ- - দুই বর্গ মাইল বিশিষ্ট। বহু লোক এই নগরে বাস করত। নগরের ভেতরে চারদিক ঘিরে ছিল অসংখ্য মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন চিকিৎসালয়। জলাশয়, শিলাতল, অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত সৌধ ও প্রশস্ত রাস্তা নগরের শোভা বর্ধন করত। নগরের মাঝখানে পিরামিডের আকৃতি বিশিষ্ট একটি শিব মন্দির ছিল। একে বলা হত **বেয়নের মন্দির**। এর গম্বুজ সংখ্যা ছিল চল্লিশ। মন্দিরের গায়ে অসংখ্য মগ্ন শিবের মূর্তি খোদাই করা ছিল।

আঙ্কোরথোমের দক্ষিণে মাইলখানেক দূরত্বের মধ্যেই আরেকটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি হল আঙ্কোরভাট মন্দির। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির। আঙ্কোরভাট তৈরী করিয়েছিলেন কম্বোজরাজা **সূর্যবর্মন**। এটি ছিল বিষ্ণু মন্দির। (এর স্থাপনকাল হল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী।) জলবেষ্টিত ছিল এই মন্দির। এর সামনেই ছিল বেয়নের মন্দির। একটি সেতুদ্বারা দুই মন্দির যুক্ত ছিল। এই মন্দিরটির নির্মাণ কৌশল বিস্ময়কর। মঞ্চের উপর মঞ্চ তৈরী করে ধাপে ধাপে উঁচু করে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যেক ধাপে উঁচু স্তম্ভ। এই মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের এক গৌরবময় নিদর্শন।

মালয় ও যবদ্বীপ - বরোবুদুরঃ মালয় ও সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সুমাত্রার সভ্যতা ছিল বৌদ্ধপ্রধান অথচ যবদ্বীপের সভ্যতার মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ছিল বেশী। যবদ্বীপ হল বর্তমান জাভা। মালয়ে শৈলেন্দ্র- বংশের রাজারা



আংকোরভা'ট

একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে জাভা বা যবদ্বীপ শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চল নিয়ে এই বড় সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। প্রতিবেশী রাজ্য চম্পা ও কম্বোজের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজাদের প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। দক্ষিণ ভারতের রাজা, রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্র রাজ্যের একটি অংশ দখল করে নিয়েছিলেন। শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমার ঘোষ ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশের গুরু।

শৈলেন্দ্র রাজারা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বরোবুদুরের স্তুপ নির্মাণ। এটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম একটি বৌদ্ধস্তুপ। (অষ্টম শতাব্দীতে) যবদ্বীপের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর ছয়তলা এই স্তুপটি নির্মিত হয়েছিল। এই স্তুপটি ভারতীয় ও যবদ্বীপের শিল্পকার্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শৈলেন্দ্র রাজাদের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির চিহ্ন বহন করছে এই স্তুপ। এটি পর পর নয়টি স্তরে গঠিত। এর ভিত্তি ১৩১ গজ। সম্পূর্ণ মন্দিরটির আটটি কোণ ছিল, আর ছিল চারটি মঞ্চ। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ হলেন বৌদ্ধ তারাদেবী, অথচ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তিও মন্দিরের মধ্যে রয়েছে।



বরোবুদুর বৌদ্ধস্তুপ

অনুশীলনী

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) হীনযান বলতে বোঝায়— ব্রাহ্মণদের/জৈনদের/হূণদের/বৌদ্ধ প্রাচীন পন্থীদের।

(খ) বিয়নের মন্দির ছিল— আঙ্কোরথামে/জাভাতে/কাঞ্চীতে/চম্পাতে।

(গ) অরেলস্টাইন বিখ্যাত ছিলেন— সাহিত্যিক হিসাবে/পুরোহিত হিসাবে/সম্রাট হিসাবে/পুরাতত্ত্ববিদ হিসাবে।

(ঘ) সূর্য বর্মন তৈরি করেছিলেন— আঙ্কোরভাট/বিক্রমশীলা/নালন্দা/থানেশ্বর।

২। নীচের ঐসব ব্যক্তি, ঘটনা ও শব্দ কীজন্য বিখ্যাত লিখ ঃ
আঙ্কোরথাম, স্রংসান গাম্পো, বৃহত্তর ভারত, অতীশ দীপঙ্কর, সুবর্ণভূমি।

৩। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) কার প্রচেষ্টায় মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে?

(খ) বৌদ্ধ ধর্মের মূলভাগগুলি কী কী ?

(গ) কুমারজীব কে ছিলেন?

(ঘ) ই-সিং কীজন্য বিখ্যাত?

(ঙ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় যোগাযোগ কোন পুস্তক থেকে জানা যায়?

(চ) চম্পা রাজ্যের বর্তমান নাম কী?

৪। ডান ও বামদিকের কথাগুলি সাজাও ঃ

যশোবর্মন	বৌদ্ধবিহার
অতীশ দীপঙ্কর	কম্বোজ
সোমপুর	শৈলেন্দ্র বংশ
বরোবুদুর	বিক্রমশীলা

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) ভারতের সভ্যতা কীভাবে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল?

(খ) দক্ষিণ এশিয়ার কোন কোন দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল?

(গ) চীনে/তিব্বতে কাদের চেষ্টায় ভারতীয় সভ্যতা প্রবেশ করেছিল?

(ঘ) সুবর্ণভূমি কোন অঞ্চলকে বলা হোত?

৬। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) বহির্ভারতে কীভাবে ভারতীয় সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে?

(খ) ভারতীয় সভ্যতা প্রসারে অতীশ দীপঙ্করের ভূমিকা কেমন ছিল?

(গ) আঙ্কোরভাট/বরোবুদুর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

।। দ্বাদশ অধ্যায় ।।

● ইসলামের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঃ তুর্কো-আফগান যুগ ●
।। (১২০৬-১৫২৬ খ্রীঃ)।।

সূচনা ঃ ভারতে ইসলামের আগমন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করেছিল। প্রাক-ইসলামি যুগে আরব বণিকদের ভারতের পশ্চিম উপকূলে যাতায়াত ছিল। বাণিজ্য পথ ধরেই এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আরব দেশে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পরে ক্রমশ এই যোগাযোগের প্রসার ঘটে। প্রথমে কেরলে এবং পরে সিন্ধুদেশে ইসলামের প্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। তারপর ক্রমাগত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের স্থলপথে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি ও ধর্মীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিল্লীতে সুলতানি আমলের সূচনা হয়। পানিপথের যুদ্ধে বাবর কর্তৃক ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় পর্যন্ত ৩২০° বছর ধরে দিল্লীতে তুর্কো-আফগান সুলতানরা রাজত্ব করেন। তারপর শুরু হয় মুঘল আমল।

(ক) কেরল ও সিন্ধু দেশ ঃ মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা অর্থনৈতিক যোগাযোগ ঃ দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সময়েই (৬৩৪-৬৪৪ খ্রীঃ) ভারতের সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আরব বণিকদের সঙ্গে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কেরলে আসেন। বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতেই তাঁরা বসবাস শুরু করেন। মিলেমিশে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তারা বাস করেছেন বহু বছর। স্থানীয় হিন্দু শাসকদের অনুমোদন লাভ করে তাঁরা প্রার্থনার জন্য মসজিদও স্থাপন করেন। ক্রমশ ভারতের পূর্ব উপকূলেও মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথায় নিপীড়িত স্থানীয় অধিবাসীরা ইসলামের সাম্য নীতির আকর্ষণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে। তখনও এখানে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেনি। স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে আরবের মুসলিম বণিকদের সু-সম্পর্ক ছিল। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে আরব মুসলমানরা সিন্ধুদেশ জয় করায় এই অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্র পরিবর্তিত

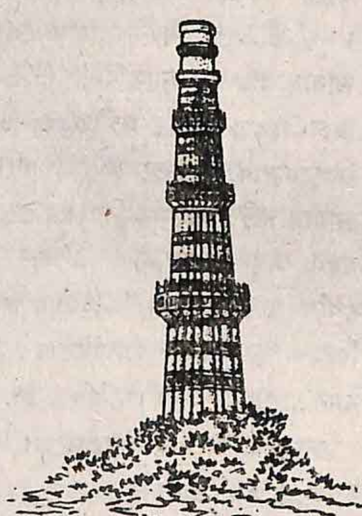
হয়। মহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরব সেনাবাহিনী সিন্ধুদেশ দখল করে। সিন্ধুতে মুসলিম শাসন প্রায় তিনশত বছর ছিল। অবশ্য সিন্ধুদেশের বাইরে ভারতের অন্যত্র আরব শাসনের প্রভাব পড়েনি। এই কারণে ঐতিহাসিকরা সিন্ধুতে আরব শাসনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি। তাহলেও এই শাসন বিভিন্ন দিক থেকে লক্ষ্যণীয় ছিল। এখানে আরব শাসনের ফলে ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং আরব মুসলমানরা পূর্ব উপকূলে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন নতুন বসতি স্থাপনে উৎসাহিত হয়। এই সময়েই মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সিন্ধু দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কুফা অঞ্চলের চর্ম শিল্পে নিযুক্ত দক্ষ শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসায় মাকরান ও সিন্ধুর চর্মশিল্পীরা উন্নত ধরনের চামড়ার জিনিস তৈরি করতে সক্ষম হয়। সিন্ধুতে তৈরি জুতোর চাহিদা খলিফার শাসিত অঞ্চলে বৃদ্ধি পায় এবং সিন্ধুর চর্মশিল্পীরা লাভবান হয়। এমন কি, সিন্ধুতে উটের সংখ্যা বাড়ানোর পদ্ধতির উন্নতি ঘটে এবং সিন্ধুর নিকটবর্তী দেশগুলোতে উটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সাংস্কৃতিক যোগাযোগও জ্ঞানচর্চাকে প্রসারিত করে। শহরের অধিবাসীরা আরবি ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় কথা বলত। ৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধী ভাষায় কোরআন অনুদিত হয়। আরবরা সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে। সঙ্গীত ও চিত্রকলার দ্বারাও তারা প্রভাবিত হয়। সিন্ধুদেশের পণ্ডিতদের বোগদাদে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে সংস্কৃত ভাষায় রচিত এইসব বিষয়ের গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়। আবু মাসার নামে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বারাণসীতে দশ বছর থেকে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। এইভাবে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আরব দেশে প্রসারিত হয় এবং আরবদের মাধ্যমেই ইউরোপ এই জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হয়। ইসলামি বিজ্ঞানের উন্নতিতে সিন্ধুর পণ্ডিতদের অবদান উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে সিন্ধু দেশের বহুলোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাই ধর্ম ও জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে। স্বভাবতই তার প্রভাব স্থায়ী হয়।

(খ) তুর্কো-আফগান জাতির ভারতে আগমন ঃ আরবরা ভারতবিজয়ের



কুতুবউদ্দীন

যে কাজ অসমাপ্ত রেখেছিল দশম শতাব্দীতে তুর্কী জাতি সেই কাজ নতুন করে শুরু করে। দুই তুর্কী নেতা আলাপ্তগিন ও তাঁর জামাতা সবুক্তিগিন-এর নেতৃত্বে এই সময়ে আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনী নামক স্থানে একটি তুর্কী রাজ্য ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সবুক্তিগিন ও তাঁর পুত্র মামুদ একাধিবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি মুসলমান রাজ্য গড়ে তোলেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হয়। গজনীর অধীনস্থ ঘুর নামে একটি রাজ্য এর পর থেকে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। ঘুর ছিল গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী একটি পার্বত্য রাজ্য। এই রাজ্যের শক্তিশালী শাসক মহম্মদ ঘোরী সিন্ধু ও পাঞ্জাব দখল করেন। মহম্মদ ঘোরী জানতেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাদের মধ্যে কোন ঐক্য নেই। ভারতীয় রাজাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন।



কুতুবমিনার


দিল্লীর
সুলতানি সাম্রাজ্য
রাজ্য সীমা
আফগানিস্থান
কাশ্মীর
লাহোর
দিল্লী
জৌনপুর
তিব্বত
ব্রহ্মপুত্র নদ
আসাম
গৌড়
নদীয়া
রণথম্ভোর
চিতোর
সোমনাথ
দৌলতাবাদ
গণ্ডোয়ানা
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
দ্বারসমুদ্র
চোল
পল্লব
মাদুরা
সিংহল
সুলতানি সাম্রাজ্য

১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আজমীর ও দিল্লীর রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহানকে তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত করেন। এর দু'বছর পরে গাহড়য়ালরাজ জয়চন্দ্রও তাঁর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। আজমীর, দিল্লী ও তার সংলগ্ন অঞ্চল ঘুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দিল্লী হল মহম্মদ ঘোরীর অধিকৃত ভারতীয় রাজ্যের রাজধানী। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর এক ক্রীতদাস **কুতবউদ্দীন আইবক** দিল্লীর শাসক হলেন। ১২০৬ সালে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে দিল্লীর সুলতানী শাসনের শুরু বলে ধরে নেওয়া হয়। দিল্লীর শাসকদের উপাধি ছিল **সুলতান**। এই জন্য ১২০৬ সাল থেকে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে (১৫২৬ সালে) বাবরের হাতে ইব্রাহিম লোদীর পরাজিত হওয়ার ঘটনা পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময়কাল তাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে **সুলতানী শাসনকাল** বলা হয়।

সুলতানী যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দিল্লীতে পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। এইগুলি হল যথাক্রমে **দাসবংশ** (১২০৬-১২৯০ খ্রীঃ)। **খল্‌জী বংশ** (১২৯০-১৩২০ খ্রীঃ), **তুঘলক বংশ** (১৩২০-১৪১৩ খ্রীঃ), **সৈয়দ বংশ** (১৪১৪-১৪৫১ খ্রীঃ) ও **লোদী বংশ** (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ)। এই পাঁচটি রাজবংশ দিল্লীতে রাজত্ব করেছিল মোট ৩২০ বছর। দাস বংশের শাসক ছিলেন পাঁচজন-কুতুবউদ্দীন আইবক, তাঁর জামাতা ইলতুৎমিস, ইলতুৎমিসের কন্যা **রিজিয়া** ও পুত্র নাসিরউদ্দীন ও **বলবন**। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। পরে তারা দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এই কারণেই বোধহয় '**দাস**' বংশের নামকরণ। কিন্তু অনেকে এই রাজবংশকে দাসবংশ বলতে আপত্তি করেন। তাঁরা এ যুগকে সাধারণভাবে তুর্কো-আফগান যুগ বলে বর্ণনা করার



রিজিয়া

পক্ষপাতী। মধ্যযুগে রিজিয়ার সিংহাসনলাভ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বংশের শাসকদের তিনটি বড় কৃতিত্ব—এক, তাঁরা দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতির আক্রমণ প্রতিহত করে ভারতকে রক্ষা করেন। দুই, তাঁরা সিন্ধু প্রদেশ ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহকে দমন করেন, গজনীর সুলতানদের হাত থেকে পাঞ্জাবকে রক্ষা করেন এবং আমির ও উলেমাদের ক্ষমতাকে সংযমের মধ্যে বেঁধে ভারতবর্ষে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন। তিন, তাঁরা উজ্জয়িনী প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্যের সীমাকে বৃদ্ধি করেন।

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য প্রকৃত বিস্তারলাভ করেছিল খলজী ও তুঘলক যুগে। খল্‌জী শাসক আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ) গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের মত দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি রণথম্ভোর দুর্গ অধিকার করেন এবং গুজরাট ও চিতোর জয় করেন। তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করে দেবগিরি ও দোরসমুদ্রের রাজাকে পরাজিত করেন এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। আলাউদ্দিনের সময়েই দিল্লীর সুলতানী শাসন সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করল। অবশ্য পরবর্তীকালে তুঘলক বংশের শাসক মহম্মদ বিন তুঘলক সমস্ত দক্ষিণ ভারতকে নিজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এনেছিলেন। আলাউদ্দিন খল্‌জী ও মহম্মদ বিন তুঘলক নানারকম সংস্কারকার্য চালু করেছিলেন। আলাউদ্দিন ভোগ্য পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন আর মহম্মদ বিন তুঘলক দেশে তামার নোট চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা দুজনেই শাসন ও বিচার-ব্যবস্থায় নিজেদের বিচার-বিবেচনার উপর জোর দিতেন। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তুঘলক রাজত্বের শেষ দিকে দেশে নানা স্থানে বিদ্রোহ ঘটে। সুলতানী শাসনের অবক্ষয় ও পতন



আলাউদ্দীন খলজী

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফিরোজ শাহ তুঘলক চেষ্টা করেও এই পতনকে রোধ করতে পারেননি। কিছুদিনের মধ্যে তৈমুর লঙ্গের ভারত আক্রমণ (১৩৯৮-৯৯) এই পতনকে নিশ্চিত করেছিল। তিনি ধনরত্ন লুণ্ঠন করে দিল্লীকে শ্মশানে পরিণত করেন এবং দেশে ফিরে যান।

তুঘলক বংশের পতনের পর দিল্লীতে সৈয়দ বংশের রাজারা রাজত্ব করেন। সৈয়দদের পর লোদী নামে এক আফগান বা পাঠান বংশ রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী ও রাজপুত রাজা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের সূচনা করেন।

(গ) সুলতানীযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ঃ সুলতানী যুগের ভারতবর্ষের সমাজ ও অর্থনীতির কথা আমরা জানতে পারি হাসান নিজামী, জিয়াউদ্দিন বারণী, মিনহাজ উদ্দিন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের রচনা, আমীর খসরুর* কবিতা এবং ইবন বতুতা, নিকিতিন, নিকোলো কন্টি, আবদুর রাজ্জাক, পাত্রস প্রমুখ পর্যটকদের বর্ণনা থেকে।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ ভারতবর্ষ ছিল গ্রামপ্রধান, তার জীবন ছিল কৃষিভিত্তিক। সমাজ স্পষ্টত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। সমাজের নীচের তলায় ছিল কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত মানুষ। আর উপরের তলায় ছিল আমীর, উলেমা ও শাসক শ্রেণীর মানুষ। কৃষকরা শ্রম দিয়ে ফসল ফলাত আর তাদের শোষণ করে বেঁচে থাকত উপরতলার সুবিধাভোগী মানুষেরা। আমীর খসরু লিখেছেন যে, সুলতানের মুকুটের প্রতিটি মণিই হচ্ছে জমাট বাঁধা কৃষকের চোখের জল। নিদারুণ শোষণের ফলে কৃষকদের দারিদ্র্য চরমে উঠেছিল।

জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা সুলতানরা ভাবতেন না। সুলতানী শাসন কোনদিন জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে গড়ে ওঠেনি। সামরিক শক্তিই ছিল তার ভিত্তি। মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করা হয়। তার ফলে কৃষকদের দুরাবস্থা বেড়ে যায়। তাছাড়া ছিল জায়গীরদারদের অত্যাচার।

* আমীর খসরু--সুলতান আলাউদ্দিনের সভাকবি। তাঁকে সে কালের হিন্দুস্তানের 'তোতাপাখি' বলা হত।

সূতী, সিল্ক, পশম, চিনি, কাগজ ও নানা ধাতুর দ্রব্য তৈরি করার কারখানা স্থাপিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। মুসলমানরা ছিল শাসক ও যোদ্ধা। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।

সামাজিক জীবন ঃ গ্রামে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল। ইসলামের প্রভাব থেকে বাঁচবার জন্য প্রথম দিকে হিন্দু সমাজ বর্ণ ব্যবস্থাকে কঠোর করেছিল এবং মেয়েদের পর্দার আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গে সতীদাহ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি কু-প্রথাগুলি বলবৎ থাকায় নারীর মর্যাদা অনেকখানি হ্রাস হয়েছিল। অভিজাত পরিবার ছাড়া নারীর উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই এই সময়ে ছিল না।

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল, মুসলমান সমাজে ছিল উলেমাদের। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া ও সুন্নী এই দুটি ভাগ ছিল। সুলতানরা ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। ফিরোজ শাহ তুঘলকের মত কোন কোন সুলতান ছিলেন 'গোঁড়া মুসলমান'। তাঁদের সময়ে হিন্দুরা নানারকম বিশেষ কর দিতে বাধ্য হত। হিন্দুদের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হত না। আবার, তার পাশে মহম্মদ বিন তুঘলকের মত শাসকও ছিলেন যিনি হিন্দুদের প্রতি সহনশীলতা দেখিয়েছিলেন।

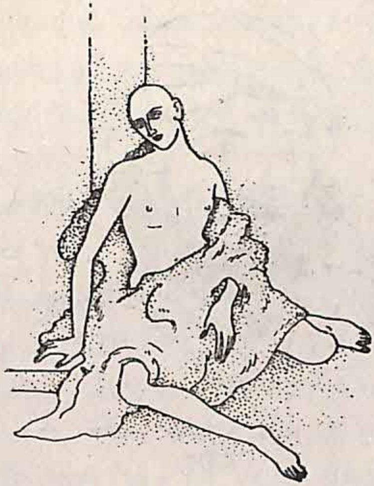
সুলতানী যুগে বাংলা দেশ ঃ দিল্লীর সুলতানরা কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশকে নিজেদের শাসনে আনতে পারেননি। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই বাংলার শাসন কর্তারা দিল্লীর কর্তৃত্ব উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের বাইরে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল দুটি স্বাধীন রাজবংশ—ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৪২-১৪৮৬ খ্রীঃ) ও হুসেন শাহী বংশ (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীঃ)। এই দুই রাজবংশের রাজত্ব কালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল। বাংলাভাষায় বেশ কয়েকটি সুগ্রন্থ এই সময়ে রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে আছে রূপ গোস্বামীর লেখা বই বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব। এই সময়েই মালাধর বসু বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেন। সুলতানী যুগে নির্মিত হয়েছিল পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ও গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ এবং বড় সোনা মসজিদ। স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে এগুলি সুলতানী যুগের চর্চার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ভক্তিবাদ ও সূফী আন্দোলন—সুলতানী যুগ থেকে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম দুটি বিরাট সামাজিক শক্তি হিসাবে পাশাপাশি অবস্থান করতে শুরু করে। ফলে তাদের মধ্যে দেয়া-নেয়া চলতে থাকে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের পথটি ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে ওঠে। এই সময়ে এমন কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা বর্ণভেদকে অস্বীকার করতে শুরু করলেন এবং ভক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সাধনার কথা বললেন। ভক্তিবাদের মূল কথাই হল যে, অন্তরের পবিত্রতা, সৎ আচরণ ও ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, কারণ একমাত্র তার মধ্যদিয়েই মানুষের প্রেমময় রূপটির বিকাশ ঘটে। এঁরা এক ও অভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি করতেন। ভগবৎ প্রেম ও সর্বজীবে প্রেমই হল প্রকৃত ধর্ম। সকল মানুষ সমান। ভগবানের সঙ্গে মানুষের একাত্মবোধ ও মানুষকে ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভগবানের সৃষ্ট সব কিছুকে ভালোবাসার কথা ভক্তিবাদে জোর দেওয়া হয়।

এইরকম ভক্তি ও প্রেমের মধ্য দিয়ে নরনারায়ণের সেবার কথা যাঁরা বলেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন **রামানন্দ, চৈতন্যদেব, কবীর, নানকদেব, বল্লভাচার্য, মীরাবাঈ ও নামদেব।**

মুসলমান সমাজের মধ্যেও এই সময়ে ভক্তিবাদ ও প্রেমময় জীবনাদর্শের ভাবনা দেখা দিতে থাকে। এই আদর্শের যাঁরা প্রবক্তা তাঁদের বলা হত সূফী ও ফকির। সূফীরা ছিলেন অতীন্দ্রীয়বাদী (ইংরাজিতে এঁদের বলা হয় 'মিষ্টিক্')। তাঁরা সমাজের কোলাহলের বাইরে থাকতেন। ধ্যানে সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের কথা বলেন। তাঁদের মতে, মন ও ইন্দ্রিয় ছাড়াই সত্যোপলব্ধি সম্ভব। এই সূফী সাধকদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া, মঈনউদ্দিন চিশতী, সেলিম্ চিশতী, শাহ জালাল প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। এইসব সূফী ফকিররা হিন্দু-মুসলমানের মঙ্গল ও মিলনের কথা বলেছেন। তাঁরা আজও সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র। পয়গম্বর হজরত মহম্মদের অনুসৃত সরল জীবনযাপন প্রণালীকে তাঁরা আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ঃ বাংলাদেশ তথা পূর্বভারতে ভক্তিবাদের সবচেয়ে বড় প্রবর্তক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীঃ)। তিনি নবদ্বীপধামে



শ্রীচৈতন্যদেব

এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তিনি বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে কৃষ্ণনাম প্রচার করেন। এই নাম প্রচারের মধ্য দিয়ে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেন। তাঁর ভক্তি ও প্রেম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন একজন মুসলমান, নাম **যবন** হরিদাস ('যবন' শব্দটির অর্থ হল হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্মের মানুষ)। তিনি জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। কীর্তনের মাধ্যমে তিনি মানুষের মন জয় করেছিলেন।



গুরু নানকদেব

নানকদেব : উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে ভক্তিবাদকে প্রচার করেছিলেন গুরু নানকদেব (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীঃ)। তিনি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলিকে গ্রহণ করে এক মহান ধর্মবোধ গড়ে তুলেছিলেন। এই ধর্মই পরবর্তীকালে শিখ ধর্ম নামে পরিচিত হয়। নানকদেব কোন জাতিভেদ মানতেন না। তাঁর মতে, সব মানুষই ঈশ্বরের নামকীর্তনের মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে। তিনি বলতেন, হিন্দু বলে কেউ নেই, মুসলমান বলে কেউ নেই। তাঁর বাণী ও পরবর্তী শিখগুরুদের উপদেশাবলীকে একত্র করে রচিত হয়েছিল শিখদের ধর্মগ্রন্থ—নাম গ্রন্থসাহেব।

উত্তর ভারতে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন

আরেকজন ভক্তিবাদী সাধক—রামানন্দ। তাঁরই শিষ্য ছিলেন একজন মুসলমান জোলা। তাঁর নাম **কবীর**। গুরু নানকদেবের মত কবীরও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনিও প্রচার করেছিলেন, সব ধর্মই এক। মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নেই। হিন্দুদের ঈশ্বর আর মুসলমানদের আল্লার মধ্যে তফাৎ নেই। কবীরের দোঁহা বা দুই পঙক্তির কবিতাগুচ্ছ হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।


কবীর

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও শিল্প-সংস্কৃতির সমন্বয় : সাম্রাজ্য বিস্তার ও রাজ্যশাসন নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান শাসক ও সামন্তপ্রভুদের যে লড়াই তা যেমন ইতিহাসের স্থায়ী ঘটনা নয়—সেইরকম সমাজের সর্বস্তরের মানুষও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। একসময়ে মুসলমান শাসকদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সাথে সাম্রাজ্য বিস্তারের আয়োজনও কমে আসে। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে চলে আসা মুসলমানরা ভারতের বিশাল জনগণের মধ্যে তাদের স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। তখন হিন্দু সমাজও তার আত্মরক্ষার জন্য কঠোর রক্ষণশীলতাকে কমিয়ে আনে। স্বাভাবিক নিয়মেই হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে ব্যবধান, অনৈক্য ও সংঘাতের ক্ষেত্রটি ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সুর দেখা দেয়।

মানুষের লৌকিক জীবন সংস্কৃতি সমন্বয়ের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। তাই ভারতের লৌকিক জীবনে সমন্বয়ের ছবিটি বড় করে দেখা দিল। সত্যপীরের উপাসনা, বিদেশী ভাষার সাথে দেশীয় ভাষার মিলনে উর্দু ভাষার উদ্ভব, মুসলমান রমনীগণ কর্তৃক ভারতীয় প্রথা গ্রহণ, হিন্দুদের

আদব-কায়দায় ও পোশাক-পরিচ্ছদে ইসলামীয় রুচির প্রভাব, হিন্দুদের ফার্সি ভাষা শেখার প্রবণতা এবং মুসলিম রাজসভায় ভারতীয় শাস্ত্র, যোগ, জ্যোতিষ, ভেষজ, গণিত, ভাষা ইত্যাদির চর্চা—এ সবের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের দেয়া-নেয়ার রূপটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে।

শিল্পরীতি ঃ সুলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে। তার ফলে যে বিশেষ শিল্পরীতি গড়ে ওঠে তা ইন্দো-মুসলিম অথবা ইন্দো-সারসিনীয় নামে পরিচিত। সুলতানরা মিনার, প্রাসাদ, নগর অথবা অন্যান্য ইমারত তৈরি করার জন্য হিন্দু শিল্পী ও রাজমিস্ত্রীদের নিযুক্ত করতেন। স্বভাবতই ইসলামীয় শিল্প ও স্থাপত্যরীতিতে হিন্দু প্রভাব পড়ে। তাছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প ও স্থাপত্যরীতিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের স্থাপত্যরীতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল দিল্লীর কুতুবমিনার, আলাই-দরওয়াজা ও তুঘলকাবাদ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। প্রাদেশিক স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যায়, আজমীরের আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া, জৌনপুরের অ তালা দেবী মসজিদ, আহমেদাবাদের জামি মসজিদ, বাংলার আদিনা মসজিদ, ছোট ও বড় সোনা মসজিদ ইত্যাদি। হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের বড় নিদর্শন হল বিজয়নগরের বিঠল দেবের মন্দির ও চিতোরের রাণাকুম্ভের বিজয়স্তম্ভ।

সাহিত্য ঃ সুলতানী আমলে আরবি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা হত। তাছাড়া ছিল উর্দু ও ফার্সি ভাষার চর্চা। একই সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষারও উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, যথা-হিন্দী, ওড়িয়া, বাংলা, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, অসমীয়া, তামিল, কানাড়ি, তেলেগু, মালয়ালাম ইত্যাদি ভাষা। আমির খসরু ছিলেন ফার্সী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছিলেন হাসান নিজামী, মিনহাজউদ্দীন, জিয়াউদ্দীন বারনী ও শামস-ই-সিরাজ আফিফ। ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদের ফলে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। অনেক আগেই আরব পণ্ডিতরা ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করে। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের উদ্যোগে কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থও ফার্সি ভাষায় অনুদিত হয়। সুলতান জয়নাল আবেদীন (১৪২০-৭০ খ্রীঃ) অনুবাদের জন্য একটি দপ্তর স্থাপন

করেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত ও কলহন্ রচিত রাজতরঙ্গিনী ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই সময়ে আঞ্চলিক ভাষাতেও রামায়ণ ও মহাভারত অনূদিত হয়।

● কী শিখলে ●

- বাণিজ্য পথ ধরেই ভারতের সঙ্গে আরবের বহুপূর্ব থেকে যোগাযোগ ঘটে। পাশাপাশি বসবাসের ফলে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।
- সুলতানরা ভারতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফাদের অধীন ছিলেন না। তাঁদের কেউ ছিলেন গোঁড়া, তবে অনেকেই শাসন ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ ও সহনশীলতার নীতি মেনে চলতেন।
- প্রথমদিকে দেশ বিজয়ের ঝড়-ঝাপটা কেটে যাবার পর হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় কাছাকাছি আসে। নানা ক্ষেত্রে দেখা যায় সংস্কৃতি সমন্বয়।
- মানুষকে ভালবাসতে ও ধর্মে ধর্মে অভিন্নতা, মানুষে মানুষে মিলনের কথা বলে গেছেন ভক্তিবাদী সাধক ও সূফী ফকিররা।

।। অনুশীলনী ।।

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) ব্যবসায়ী হিসাবে মুসলিমরা ভারতের কোন অংশে আগমন করেন?

(খ) মুসলিমদের প্রাচীন ভারতের কী কী বিষয় আকৃষ্ট করেছিল?

(গ) আবু মাসার কে ছিলেন?

(ঘ) তরাইনের যুদ্ধ কত সালে ঘটেছিল?

(ঙ) দিল্লী সুলতানী শাসন কবে শুরু হয়?

(চ) জিনিসের বাজার দর নিয়ন্ত্রণ কে করেছিলেন?

(ছ) তামার নোট কোন সুলতান প্রবর্তন করেন?

(জ) মোঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয় কবে?

(ঝ) দোঁহা কী?

(ঞ) আমীর খসরু কে ছিলেন?

(ট) কোন যুগে কুতুব মিনার নির্মিত হয়?

(ঠ) সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কোন সুলতানের শাসন বিস্তৃত হয়?

(ড) বড় সোনা মসজিদ কারা নির্মাণ করেন?

(ঢ) রাণাকুম্ভের বিজয়সৌধ কোথায় অবস্থিত?

(ণ) কার চেষ্টায় রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থ ফার্সিতে অনুবাদ করা হয়?

(ত) মহাভারত কোন যুগে বাংলায় অনুবাদ করা হয়?

(থ) চৈতন্যদেব কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(দ) সুলতানী যুগের শেষ সুলতান কে ছিলেন?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) মুসলমানদের আগমনের প্রথম পর্বে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন কেমন হয়েছিল?

(খ) তরাইনের যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল?

(গ) সুলতানী রাজত্বের 'দাস বংশের' শাসকদের কৃতিত্ব কী ছিল?

(ঘ) মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসন নীতির মূল কথা কী ছিল?

(ঙ) ভক্তিবাদী ও সুফী আন্দোলনের প্রধান প্রধান সাধক কে কে ছিলেন?

(চ) ভক্তি আন্দোলনে কবীরের মূল আদর্শ কী ছিল?

(ছ) হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয় কীভাবে দেখা দেয়?

(জ) ইন্দো-ভারতীয় স্থাপত্যরীতি বলতে কী বোঝায়?

৩। টীকা লিখ ও সময়ক্রম অনুসারে সাজাও ঃ

গ্রন্থসাহেব, আবু মাসার, সূফী আন্দোলন, মুহম্মদ ঘোরী, প্রথম পানিপথের যুদ্ধ।

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) সুলতানী যুগের সামাজিক/অর্থনৈতিক জীবন বর্ণনা কর।

(খ) কার কার লেখা থেকে সুলতানী যুগ সম্বন্ধে জানা যায়?

(গ) শাহী আমলে বাংলার শিল্প ও সাহিত্যের প্রধান প্রধান দিক আলোচনা কর।

(ঘ) ভক্তিবাদী ও সূফী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল কেন ?

(ঙ) ভক্তিবাদী আন্দোলনে শ্রীচৈতন্য ও গুরু নানকের অবদান কী ছিল ?

(চ) হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন শিল্পে/সাহিত্যে কেমন দেখা গিয়েছিল?

৫। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) আরব মুসলিমরা প্রথম ভারতে এসেছিল— পরিব্রাজক রূপে/বণিক হিসাবে/শিল্পী হিসাবে।

(খ) মুহম্মদ ঘোরীর ভারত জয়লাভের অন্যতম কারণ ছিল—

১) ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য।

২) রাজাদের যুদ্ধের প্রতি অবহেলা।

৩) পৃথ্বীরাজ চৌহানের বিরোধিতা।

(গ) সুলতানী শাসকগণ— কোন বৈদেশিক শাসকের প্রতিনিধি ছিলেন না/ গজনীর অধীন ছিলেন/ঘুর রাজ্যের অধীন ছিলেন।

(ঘ) হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির অন্যতম দিক হোল—উর্দু ভাষার সৃষ্টি/জাতিভেদ প্রথার জন্ম/সত্যপীরের উপাসনা বন্ধ হওয়া।

৬। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর ঃ

(ক) দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ ঘোরী।

(খ) ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে চেঙ্গিস খাঁ ভারত আক্রমণের চেষ্টা করেন।

(গ) মালিক কাফুর ছিলেন আলাউদ্দীনের প্রধান সেনাপতি।

(ঘ) গুরু নানক বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

(ঙ) কুতুবউদ্দীন গজনীর অধিপতি ছিলেন।

(চ) ফিরুজ তুঘলকের সময় সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ করা যায়।

(ছ) সিন্ধুদেশ জয়ের মধ্য দিয়ে আরবদের ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে।

(ঝ) গুরু নানকের আমলে মহাভারত ফার্সীতে অনুবাদ করা হয়।

(ঞ) কবীরের আমলে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়।

● মধ্যযুগের শেষ পর্ব (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী) ●

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ও নবজাগরণের ওপর তার প্রভাব : ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী সম্রাট দ্বিতীয় মহম্মদের হাতে শেষ বাইজানটাইন বা পূর্ব রোমান সম্রাট একাদশ কনস্ট্যান্টাইন পরাজিত হলে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটে। এই ঘটনার ফল হয়েছিল দুটি। প্রথমত, পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের পণ্ডিতরা তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে পশ্চিমে পালিয়ে যান এবং ইটালীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, স্থলপথে প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের যোগযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। প্রথম ঘটনাটি ইউরোপের জ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত করে। দ্বিতীয় ঘটনাটির ফলে স্থলপথে আসতে না পেরে পশ্চিম ইউরোপের মানুষ জলপথে এশিয়ার দিকে আসার চেষ্টা করে। এই ঘটনা ইউরোপের নবজাগরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাভাবিত করে।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য : দশম শতাব্দী থেকে ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন চর্চা দেখা দিতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন ও শহরের বিকাশ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল ও দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মানুষের মনে একটা নবজাগরণ ঘটেছিল। এটিকে দ্বাদশ শতকীয় নবজাগরণ বলা হয়ে থাকে। এই নবজাগরণের ধারা তার পূর্ণতা পেয়েছিল চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এই পর্বের নবজাগরণ হল মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা কাল। মানবমুক্তি, যুক্তিবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, জাগতিকতা ও মানবতাবোধ (Humanism)—এই পাঁচটিই ছিল রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞানোন্মেষ : রেনেসাঁস ইউরোপে জ্ঞানোন্মেষে সহায়তা করেছিল। এর দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, নতুন সংস্কৃতি ইটালীর নগররাষ্ট্রগুলির বণিকদের অর্থে পুষ্ট হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তখন আরব দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ইটালীতে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও ইটালীর সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল। প্যারিস, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, কলোন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য পণ্ডিত তখন ইটালীতে পড়াশুনা

করতে গিয়েছিলেন। ফলে জনগণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটেছে।

রেনেসাঁসের মনীষীবৃন্দ : ইটালীয় ভাষায় অসাধারণ সাহিত্য রচনা করে নবজাগরণের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন **দান্তে** (১২৬৫-১৩২৯), পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪) ও বোকাচিও (১৩১৩-৭৫)। এঁরাই ইটালীও ভাষাকে একটি জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন। রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো ও লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি তাঁদের শিল্পকর্মে মানুষকে বড় করে তোলেন। শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারও এই সময়ে ঘটেছিল। তার ফলে অনেক প্রচলিত বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়েছিল। যেমন, **কোপারনিকাস** আবিষ্কার করলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কারের মাধ্যমে দেখালেন যে, সৌরমণ্ডলে সব গ্রহই চলমান। ব্রুনো বললেন যে, সূর্য ও গ্রহগুলো সমস্তই নক্ষত্র জগতের অংশমাত্র। এই সব বিজ্ঞানীরা প্রচলিত বিশ্বাসের উপর আস্থা না রেখে প্রকৃতিকে যাচাই করে নতুন জ্ঞানকে তুলে ধরেছিলেন।

ভৌগোলিক আবিষ্কার : কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপ ও এশিয়ার স্থলবাণিজ্যের পথগুলি তুর্কীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় ইউরোপীয় বণিক ও নাবিকরা প্রাচ্যে আসার জন্য নতুন জলপথ সন্ধান করতে লাগলেন। ১৪৮৭খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক **বারথলোমিউ দিয়াজ** আফ্রিকার দক্ষিণে অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে আসেন। নতুন পথ খুঁজতে গিয়েই ১৪৯২খ্রীষ্টাব্দে **কলম্বাস** আমেরিকা ও ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে পৌঁছনোর পথ আবিষ্কার করেন। ম্যাজেলান আবিষ্কার করেন প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিলিপিনস্ দ্বীপপুঞ্জ। নতুন নতুন জলপথ ও দেশ আবিষ্কারের ফলে ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, আর বাণিজ্যের হাত ধরে আসে সামুদ্রিক প্রাধান্য ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা।

জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব : মধ্যযুগের শেষের দিকে সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের ফলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে রাজা ও বণিকদের যৌথ উদ্যোগে নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হল।

নেদারল্যাণ্ডের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই : ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে নেদারল্যান্ড ক্ষমতাশালী স্পেনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৫৬৬ ও

১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডের মানুষ, স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পরে বিদ্রোহীরা নেদারল্যাণ্ডকে হল্যান্ড নাম দিয়ে একটি নতুন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে।

ইউরোপের সম্প্রসারণ—ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ঃ সামুদ্রিক অভিযান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপের কয়েকটি দেশ বিশেষ করে স্পেন ও পর্তুগাল বহির্বিশ্বে তাদের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে স্পেন ও পর্তুগাল দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন ওলন্দাজরা জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে, ইংল্যাণ্ড দক্ষিণ এশিয়ায় এবং ফরাসীরা কানাডা এবং আরও পরে ইন্দোচীনে সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

পুরাতন ব্যবস্থা ও পরিবর্তনের সংঘাত—ইংরাজ বিদ্রোহ ঃ মধ্যযুগের শেষ দিকে পুরাতন ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিল। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হচ্ছিল এবং নতুন বণিক ও মধ্যশ্রেণীর মানুষের জন্ম হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর্বিভাব ও রেনেসাঁসের ফলে নতুন জ্ঞানোন্মেষ দেখা দিতে থাকে। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বাড়তে থাকে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষের মন থেকে ধর্মসংক্রান্ত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ভেঙ্গে যেতে থাকে। এই সমস্ত কিছুর চাপে অর্থনীতিক ব্যবস্থাও বদলায়।

এই সমস্ত পরিবর্তনকে সামন্ত ব্যবস্থা সহজে মেনে নেয়নি। ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনে প্রথমদিকে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় কৃষকদের সঙ্গে জমিদারের লড়াই ছিল অবশ্যম্ভাবী। ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াট টাইলরের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে কৃষক বিদ্রোহ হয়। সামন্ততন্ত্রের অবাধ শাসন ও নিরঙ্কুশ শোষণকে বিদ্রোহ অনেকটাই রুখে দিতে পেরেছিল। এই পরিবর্তনশীল পটভূমিতেই আধুনিক যুগের জন্ম হয়েছিল।

● কী শিখলে ●

● পূর্ব রোম সাম্রাজ্য ও সামন্ত প্রথার অবসানে মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের সূত্রপাত।

- মধ্যযুগের প্রায় হাজার বছর ধরে ধর্মীয় হানাহানি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ভাঙা গড়া সত্ত্বেও ইউরোপ ও ভারতে নতুন জাতি, নতুন মানসিকতা, নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। সভ্যতা মধ্যযুগ পার হয়ে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে।
- নগর বিপ্লবের ফলে দেশ ও রাষ্ট্রে নানা পরিবর্তন ঘটে। সার্ফ ও ক্রীতদাসরা মুক্তি পায়।
- ইউরোপের ঐ অস্থিরতার মাঝে আরব সভ্যতা জন্ম নেয়। বোগদাদ শহরী পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের পথ খুলে দেয়। সভ্যতা পরিপুষ্ট হয়।
- আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য ঃ রেনেসাঁস, ভৌগোলিক আবিষ্কার, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি, পুরাতন ও নূতনের মধ্যে সংঘর্ষ, জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব।

অনুশীলনী

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) কত খ্রীষ্টাব্দে কনষ্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটে?

(গ) কোপারনিকাস কিজন্য বিখ্যাত?

(ঘ) আমেরিকা/ভারত/ফিলিপিনস্ কে আবিষ্কার করেন ?

(ঙ) রেনেসাঁস কোন দেশে ঘটেছিল?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) রেনেসাঁস কথাটি বলতে কী বোঝায়?

(খ) রেনেসাঁস বিজ্ঞানীরা কোন মূল আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন?

(গ) ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ কী ছিল?

(ঘ) ইউরোপের অধিবাসীরা কোন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফল কি হয়েছিল?

(খ) রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

(গ) সাহিত্য/শিল্প ও বিজ্ঞানে রেনেসাঁসের প্রভাব আলোচনা কর।

(ঘ) ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পেছনে কী কী কারণ ছিল?

(চ) মধ্যযুগে পুরাতন ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল কেন?

(ছ) নেদারল্যাণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন কেন ঘটে?

(জ) ইংল্যান্ডের কৃষক বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল কী হয়েছিল?

৩। টীকা লেখ ঃ

কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, পেত্রার্ক, ম্যাজেলান, ওয়াট টাইলার, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি।

সময়পঞ্জী

১১১০—প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় (নোটরডাম)।
১১২২—সম্রাট ও পোপের মধ্যে অভিষেক দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি।
১১৫৫-১২৮৭—চেঙ্গিস খাঁ।
১১৮৭—সালাদীন।
১১৯৩—অ্যালবার্ট ম্যাগনাস।
১২০৯—কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।
১২২৪—টমাস অ্যাকুইনাস।
১২৬৫—দান্তে।
১২৭১—মার্কো পোলোর চীনযাত্রা।
১২৮০—ইউয়ান যুগ-কুবলাই খাঁ।
১২১৪—রজার বেকন।
১৩৪০—চসার।
১৩৫৮—ফ্রান্সে কৃষক বিদ্রোহ।
১৩৮১—ইংল্যান্ডে কৃষক বিদ্রোহ (ওয়াট টাইলার)।
১৪৫৩—কনস্ট্যান্টিনোপল ও পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের পতন—আধুনিক যুগের শুরু।
১৪৯২—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার।
১৪৯৮—ভাস্কোডোগামার জলপথে ভারত আবিষ্কার।

ভারতবর্ষ

৪২৪—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪৫৬-৬৭—স্কন্দগুপ্ত ও শ্বেত হূণ আক্রমণ।
৪৯৬—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন।
৬০৬ (আঃ)—শশাঙ্ক।
৬০৬-৬৪৭—হর্ষবর্ধন।
৬১০-৬৪২—দ্বিতীয় পুলকেশী (চালুক্য)।
৬৩০-৬৪৪—হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ।
৬৩০—নরসিংহ বর্মন (পল্লব)।
৭১২—আরবদের সিন্ধু অধিকার।
৭৫০—পাল বংশ।
৭৭০ (আঃ)—বরোবুদুর।
৭৭০—ধর্মপাল ও কনৌজকে ঘিরে ত্রিমুখী লড়াই।
৯৮৫—প্রথম রাজরাজ চোল।

১০১৪—রাজেন্দ্র চোল।
১০২০—রাজা ভোজ-পারমার বংশ।
১০১৩—আঙ্কোর ভাট।
১১৪০—অতীশ দীপঙ্কর।
১১৯২-১২০৬— পৃথিরাজ চৌহানের মৃত্যু-মুহম্মদ ঘোরী।
১২০৬-১২৯০— তুর্কো-আফগান বংশ।
১২৯০-১৩২০—খলজী বংশ।
১২৯৬-১৩১৬—আলাউদ্দীন খলজী।
১৩২০-১৪১৩—তুঘলক বংশ।
১৩২৫-১৩৫২—মহম্মদ বিন তুঘলক।
১৩৪২—ইলিয়াস শাহী বংশ।
১৩৯৮—তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ।
১৪১৪-১৪৫১—সৈয়দ বংশ।
১৪৫১-১৫২৬—লোদী বংশ।
১৪৬৯—গুরু নানক।
১৪৮৫—শ্রীচৈতন্য।
১৪৯৩—হুসেন শাহী বংশ।
১৫২৬—মোঘল যুগ-বাবর।

মূল্য : ১৬.০০ টাকা

নং ....ইতিহাস/সপ্তম/৯৬